
অথ
বিবাহ
ঘটিত
ডাঃ নগেন্দ্রনাথ দে

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য-কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

অগ্রহায়ণ
১৩৪৬

ছেপেছেন—
এস. সি. মজুমদার
দেব-প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

উ অথ বিবাহ ঘটিত

প ডাঃ নগেন্দ্রনাথ দে

হা

র

মানুষ কি চায়—

মানুষ চায় টাকাকড়ি, স্ত্রীপুত্র, যশখ্যাতি, সোজা কথায় এ সংসারে প্রতিষ্ঠা নিয়ে বেঁচে থাকতে।

তাই মানুষ ছুটে চলে অর্থ উপার্জনের আকাঙ্ক্ষায়, সংসার সৃষ্টির দিকে।

একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যায় তার এই সব বাসনার পেছনে রয়েছে একটিমাত্র উদ্দেশ্য যা সে নিজেও সব সময়ে অনুভব করতে পারে না, সে উদ্দেশ্য হল কি করে কষ্টের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়, আর কিসে আসে পরিতৃপ্তি।

অর্থোপার্জনের দ্বারা উপবাসভীতি দূর হয়, তাই অর্থোপার্জনই হয় তার জীবনের আপাত উদ্দেশ্য।

স্ত্রীলাভ করে নিঃসঙ্গতার পীড়নের হাত থেকে সে নিজেকে রক্ষা করে, তাই পরিণয় হয় তার আর একটা উদ্দেশ্য।

এই দুটো বস্তু লাভ করার পর তার বাসনা জাগে সকলে তাকে ভাল বলুক; তার প্রশংসা করুক, তাই সে খোঁজে যশ ও খ্যাতি।

এই সব বাসনার মূল কারণ যা সাধারণতঃ মানুষ বুঝতে পারে না তা হল শান্তি ও আনন্দ লাভের আকাঙ্ক্ষা। স্ত্রীপুত্র, অর্থ ও যশ লাভ করে মানুষ খানিক উত্তেজনা লাভ করে। ভাবে, এইটাই সুখ, এইটাই জীবনের উদ্দেশ্য। উত্তেজনা চিরদিন একভাবে থাকতে পারে না। তাই উত্তেজনা কমে গেলে আসে অবসাদ। এই অবসাদই দুঃখ বা মানসিক কষ্ট।

যখন মানুষের মনে অবসাদ আসে, তখন সেই অবসাদের

কারণ নিজের মনে অনুসন্ধান না করে, সে বাইরে হাতড়ে বেড়ায়। হয়তো সেই সময়ে তার কোন নাবালক সন্তান তার নির্দেশ অবহেলা করেছে। নিজের অজ্ঞাতেই সে ভেবে বসে তার মানসিক কষ্ট ছেলের এই দুর্বিনীত কাজের ফলে হয়েছে। এই ধারণার বশে সে ছেলেকে আঘাত করে নিজের মনে উত্তেজনা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে। আসলে অবসাদ তার মনে স্বাভাবিক ভাবেই এসেছিল, কেবল সন্তানের আচরণে সেই অবসাদ ক্রোধের রূপ ধরে বাইরে বেরিয়ে আসবার সুযোগ পায়। আর এই ক্রোধের সাহায্যে সে তার স্থৈর্য বজায় রাখার চেষ্টা করে। এতে সাময়িক হয়তো উপকার পায় কিন্তু অবসাদ দ্বিগুণ বেগে তাকে আচ্ছন্ন করে। তারি ফলে সে অস্থির হয়ে বেড়ায় কিংবা লোকের সঙ্গে কলহ করে। এই অবসাদই তাহলে যত দুঃখের মূল।

এই অবসাদকে দূর করবার জন্যে মানুষ থিয়েটারে যায়, রেডিয়ো খুলে বসে, গান-বাজনার আসরে যোগ দেয়, ফুটবল খেলা নিয়ে তর্কাতর্কি শুরু করে।

এই অবসাদই মানুষের দৈনন্দিন কাজে আনে একঘেয়েমি, স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য, আর বেঁচে থাকার উপর বীতস্পৃহা।

সাধারণ মানুষ এটা সহজে বুঝতে পারে না। বাইরের ঘটনাকে তার দুঃখের কারণ ভেবে বাইরের ঘটনার উপর দোষারোপ করে। কিন্তু মূল কারণ যে তার নিজের মনে সে বিষয়ে সে অজ্ঞ থেকে যায়।

একথা বলছি না যে বাইরের ঘটনায় মন বিক্ষিপ্ত হয় না। বাইরের ঘটনা মনে আঘাত করে মনটাকে চঞ্চল করে দেয় একথা

সত্য। কিন্তু দুঃখবোধ বাইরের ঘটনায় নেই, সেটা মানুষের অন্তরেই আছে। তাই মানুষ যদি নিজের মনকে সংযত করতে পারে তাহলে বহু ছোটখাট ঘটনায় তার মন চঞ্চল না হয়ে তাকে দুঃখের হাত থেকে রক্ষা করবে।

খুব সামান্য একটা উদাহরণ ধরা যাক।

তাড়াতাড়ি খেয়েদেয়ে স্বামী অফিসে যাবেন। মনটা তাঁর বেশ একটু অস্থিরই হয়ে আছে অফিস যাওয়ার তাগাদায়। যখন বেরোতে যাচ্ছেন স্ত্রী এসে বললেন, আমার কাপড় ছিঁড়ে গেছে ফেরবার সময় একটা কাপড় এন।

এখন স্বামী যদি অস্থির প্রকৃতির মানুষ হন আর সেদিন যদি তাঁর পকেটে টাকা না থাকে, তিনি তখনি চটে উঠে বলবেন, দিনরাত কাপড় আর কাপড়। আর পারি না বাবা।

বিনা অপরাধে তিরস্কৃত হয়ে অভিমানাহত স্ত্রীও বলবেন,—বিনা মাইনের বাঁদীকে কি একটা কাপড়ও কিনে দেবার মুরোদ নেই ?

খানিক কথা কাটাকাটির পর স্বামী অফিস চলে গেলেন। সারাদিন মনটা ভার হয়ে রইল। কিছুই আর ভাল লাগছে না! দিনের শেষে বাড়ি ফিরতেও অসোয়াস্তি। আবার হয়তো এক পসলা বাক্যবাণ ছোঁড়াছুঁড়ি হবে।

এই যে সারাদিনের মনোকষ্ট, যত তুচ্ছই হোক না, কষ্ট ত বটে। স্ত্রীর কাপড় আনতে বলা বাইরের ঘটনা। এর মধ্যে দুঃখের কিছু নেই। কিন্তু এই কথাটাই স্বামীর মনকে অস্থির করে তুললো, ফলে সে সারাদিন মনে কাঁটার ব্যথা অনুভব করতে লাগলো।

কিন্তু স্বামীর যদি মনটাকে সংযত করার শক্তি থাকতো

তিনি সেখানে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে শুনে চলে যেতেন। নিশ্চিন্ত মনে কাজ করে বাড়ি ফিরে বলতেন, হাতে টাকা নেই। স্ত্রীও অবস্থা বুঝে অনায়াসেই মানিয়ে নিত।

এই সব মনের সূক্ষ্ম কারচুপিতে মানুষ অকারণে কত কষ্ট পায়, কি ভাবে নিজের ক্ষতি করে, ছেলে মানুষ করতে গিয়ে তার সর্বনাশের কারণ হয় সে সব কথা ভাবলে বিস্ময়ে, ভয়ে অবাক্ হয়ে যেতে হয়। একটুখানি ধৈর্য ধরলে যেখানে চিরদিনের বন্ধুত্ব বজায় থাকে সেখানে শুধু সামান্য এই ধৈর্যের অভাবের ফলে বহুদিনের বন্ধুত্ব বাকি জীবনের মত বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

অনেককে দেখা যায় অনাগত ঘটনাকে কল্পনা করে অহেতুক দুশ্চিন্তা করে যেতে। সেইসব চিন্তার ফলে শুধু যে তাঁরা মনোপীড়াই পান তা নয়, অনেক সময় সেগুলি শরীরের উপর কাজ করে শরীরকে অসুস্থ করে তোলে। ডাক্তারী শাস্ত্রের মতে বহু অ্যালার্জি রোগের কারণই এই দুশ্চিন্তা।

বহু লোককে দেখা যায় অযথা সন্তানকে আদর দিয়ে তাদের জিনিসপত্র প্রয়োজনের আগেই হাতের কাছে এগিয়ে দেয়। এই সব কাজের ফলে ছেলেরা স্বাবলম্বী হতে পারে না আর যখন তাদের মা বাবা পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়, নোঙর ছেঁড়া নৌকার মত সংসার তরঙ্গে হাবুডুবু খেতে খেতে কেউ কেউ সামলে নেয় কেউ বা তলিয়ে যায়। এই তলিয়ে যাবার প্রধান কারণ তার আত্মবিশ্বাস গড়ে ওঠেনি।

অনেক সময় দেখা যায় ছেলেমেয়েদের করা ভুল কাজ গার্জেনরা বড় করে তার চোখের সামনে ধরে বলেন, এইতো তোর বুদ্ধি, তোর দ্বারা কিস্যু হবে না। কিস্যু হবে না, তুই

কোন কাজের নস, তোর কোন বুদ্ধি নেই, এই সব কথা বলে তাঁরা ছেলেমেয়েদের পরকাল ঝরঝরে করে দেন।

এই রকম নানা ঘটনা প্রতিদিন আমাদের সংসারে ঘটে যাচ্ছে। আমরা কজনে তার খোঁজ রাখি কজনেই বা চিন্তা করি আমারই কাজের ফলে আমার ছেলের জীবন চিরদিনের মত বিষময় হয়ে গেল।

এইরকম ঘটনা অবলম্বনে তেরটি রচনার মারফতে লেখক তাঁর ডাক্তারী জীবনের অভিজ্ঞতা এই বইতে লিপিবদ্ধ করেছেন, যদি কারও উপকার হয় এই আশায় আমরা এই লেখাগুলি প্রকাশ করলাম—

প্রকাশক

এতে আছে

অথ বিবাহ-ঘটিত

গরমিল

আমার এই দীর্ঘ তিরিশ বছর ডাক্তারী জীবনের অভিজ্ঞতায় কতো রকমই না রুগী দেখেছি! সব চেয়ে বেশী পীড়া দেয় আমাকে, যখন দেখি নতুন বিবাহিত কোনো পুরুষ বা স্ত্রীলোক আসেন আমার কাছে চিকিৎসিত হোতে। এই সমস্ত রুগীদের রোগের কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অনেক সময় দেখেছি সামান্য ভুল বোঝার ফল কত না মারাত্মক হোতে পারে! তার বিষময় ফল কখনও বা একজন, কখনও বা দুজনেই সারা জীবন ধরে ভোগ করেন। খোলাখুলি আলোচনা বা সামান্য সহানুভূতির দ্বারা তাঁদের জীবন সুখী হোতে পারতো। তার ফলে সমাজকে তাঁরা দিতে পারতেন নতুন, সুস্থ, সবল মানুষ।

অনেকে হয়তো বলবেন, এই সমস্ত বিবাহের ব্যর্থতার প্রধান কারণ যৌন-ঘটিত ব্যাপার। কিন্তু আমি বলবো, অন্য সব দিক ঠিক থাকলেও কারণটার উৎপত্তি তা থেকে হয় না।

একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।

বিবাহের পাঁচ বছর বাদে একজন দু' সন্তানের জননী আমার কাছে এলেন, অবসাদ রোগগ্রস্ত হয়ে। সময়ে সময়ে নিজের জীবনের ওপর বীতস্পৃহ হয়ে, রোগিণীটি আত্মহত্যাও করতে গেছেন। এমন ব্যাপারও দেখেছি, দোতলা বা তেতলার ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে জীবন নষ্ট না করতে পারলেও জন্মের

মতন পা বা কোমর তাঁরা হারিয়ে বসেছেন। স্বামী অজস্র টাকা খরচা করছেন স্ত্রীর জন্যে কিন্তু কোনও উপকারই হচ্ছে না।

অনেক কারণ অনুসন্ধানের পর দেখা গেল, স্ত্রী স্বামীকে যতই সুখী করবার চেষ্টা করুন না কেন, স্বামী নাক তুলে বলেন —"উম্ এরকম করলে ? এ যে তোমার একেবারে ভুল হ'ল।" "ভুল হ'ল", "ভুল হ'ল" কথাটা শুনতে শুনতে স্ত্রীরও জীবন ভুলেই ভরে যায়। ফলে দেখা দেয় তাঁর আত্মবিশ্বাসের অভাব। এই আত্মবিশ্বাসের অভাবই পরে তাঁর মানসিক রোগরূপে দেখা দেয়।

আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় স্ত্রী স্বামীকে নির্বোধ মনে করেন, এবং স্বামীর প্রতি পদবিক্ষেপে তাঁর নিজের বুদ্ধি অনুপাতে তাঁকে চালাবার চেষ্টা করেন। স্বামী, পুত্র, কন্যা তাঁর কাছে আজ্ঞাবহ ভৃত্য ছাড়া আর কিছুই নয়। ফলে, স্বামী বেচারা পরাধীন হয়ে পড়েন এবং এই পরাধীনতার ফল ফলে মনের ওপর, প্রকাশ পায় মানসিক রোগ-লক্ষণ। স্ত্রীকে বোঝাতে গেলাম তাঁর স্বামীর রোগের কারণ। আমি যত বলি —"আপনার স্বামী লেখাপড়া শিখেছেন, তাঁরও চিন্তাশক্তি আছে। তাঁকে স্বাধীনভাবে চিন্তা করবার সুযোগ দিন।"

তিনি বিস্মিত হয়ে গিয়ে বলেন—"ও যদি একটু চিন্তা করতে পারতো, তাহলে কি আমার দুঃখের আর কোনও কারণ থাকতো। আমার মতন সুখী স্ত্রী কেউ হোত না।"

তাঁকে বোঝাতে না পেরে বিরক্ত হয়ে বলি—"তবে, আপনার স্বামী আর সারবেন না।"

কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে ভদ্রমহিলা বলেন—"ডাক্তারবাবু, আপনি

কেবল ওরই কথা শুনলেন। ও যদি ঠিক ঠিক কথা বলতে পারতো তা হলে আমার আর কি দুঃখ!"

তিনি আদৌ বোঝবার চেষ্টা করলেন না যে তাঁর স্বামীর রোগের কারণ তিনি নিজে। ফলে তাঁর স্বামী রোগমুক্তও হোতে পারলেন না কোনদিন।

আবার দেখেছি, কোনও স্ত্রী, স্বামীর উপস্থিতিতে তাঁর কোনও বন্ধু, বান্ধবী অথবা আত্মীয়ের কাছে মন খুলে গল্প করছেন, অথবা কোনও বিষয়ের আলোচনা করতে করতে সামান্য উত্তেজিত হয়ে, যুক্তিতর্ক দ্বারা তাঁর বক্তব্য বোঝাবার চেষ্টা করছেন। ঠিক এমনি সময় ছুটলো—"Bomb-shell"—ছুঁড়লেন তাঁরই স্বামী। বললেন—"থাক্ আর গলাবাজি করতে হবে না, জানি, তুমি বিদ্যের একটা জাহাজ।"

অপরের সামনে এইভাবে অপদস্থ হয়ে, স্ত্রী উঠলেন রেগে। প্রথমটা হয়তো তিনি মুখে কিছু বললেন না, মনে মনে সহ্য করবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু সহ্যের সীমা ছাড়ালো, স্ত্রী হলেন একদিন রোগগ্রস্তা।

এই দোষে কেবল যে পুরুষেরাই দোষী হন তা নয়, স্ত্রী-লোকেরাও এ থেকে মুক্ত নন। অল্পশিক্ষিতা স্ত্রী, স্বামীর মর্যাদা রক্ষা না করেই মুখের ওপর জবাব দিলেন—"হ্যাঁ, তুমি তো সব জান, কেবল খবরের কাগজ আর বই নিয়ে তো বসে আছ। সত্যিকারের বিদ্বান হলে, বহু লোকে তোমায় খাতির করতো।"

ফলে স্বামী ভুল বুঝলেন স্ত্রীকে। স্ত্রীর অন্তরে যা-ই থাক বাইরের প্রকাশটাকে তিনি সত্য বলে মেনে নিলেন, ভাবলেন তাঁর স্ত্রী তাঁকে উপেক্ষা করছেন।

আবার দেখেছি একজাতীয় পুরুষ আছেন, যাঁরা অফিসে "লেডী টাইপিস্ট" বা অন্য কোন স্ত্রীলোকের কাছে অপমানিত হয়ে, ঝালটুকু সেখানে ঝাড়তে না পেরে এসে সবটুকু বিষ উদ্গিরণ করেন স্ত্রীর ওপরে। শান্ত স্ত্রী, প্রথমটা মুখ বুজে সবটুকু সহ্য করেন। কিন্তু পৃথিবীর সব চেয়ে প্রিয়তমের কাছ থেকে বার বার এই ধরনের বিদ্রূপাত্মক ব্যবহারে তিনি হয়ে ওঠেন উত্তেজিত। স্বামীর ওপর শ্রদ্ধা, বিশ্বাস হারিয়ে ফেলার পর, বাঁচবার জন্যে কিন্তু বুঝি তাঁর অবশিষ্ট থাকে না। নিজের স্বামীকেও তাঁরা তখন শত্রু বলে বিবেচনা করেন।

অনেক সময় দেখা যায় স্ত্রীলোকের এই ধরনের বিদ্বেষ প্রকাশ পায় অন্যভাবে।

সংসারে হয়তো শাশুড়ী বা জায়ের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে, অথবা ঝিয়ের ওপর রাগ করে তাকে দিয়েছেন তাড়িয়ে। রাগের সময় ভাবতেও পারেননি, ঝি চলে গেলে, তাঁকেই বসতে হবে কলতলায় এঁটো বাসনের রাশি মাজতে। উপায় নেই, ব্যাপারটা ঘটিয়ে ফেলেছেন। যত রাগ পড়লো গিয়ে স্বামীর ওপর। স্বামী বেচারা হয়তো সবেমাত্র অফিস থেকে তেতে পুড়ে বাড়ি এসেছেন। দুম্ দুম্ করে পা ফেলে ছুটে তাঁর সামনে গিয়ে ফেললেন 'ভ্যাঁক' করে কেঁদে। শুরু করলেন তাঁর অভিযোগের পর্ব। এবং তা শেষ করলেন এই বলে—"তোমার হাতে পড়ে আমার এই খোয়ার! বাবা কি পাত্রের হাতেই না আমায় দিয়ে গেছেন! এর চেয়ে যদি সামান্য একটা মুটের হাতে পড়তাম, অথবা অমুকের (স্বামীরই পরিচিত কোনও পুরুষের নাম ধরে) হাতে পড়তাম, তা হলে আমার সুখে দিন কাটতো।"—ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এই অভিযোগ ক্লান্ত মনের ওপর আঘাত করার ফলে, তাকে করে তুললো আরও অবসন্ন। ফলে স্বামী বেচারার সুখশান্তি দিতে হলো জলাঞ্জলি। এগিয়ে গেলেন তাঁরা ভয়াবহ পরিণামের দিকে। অথচ তাঁরা একবারও কেউ ভাবলেন না দু-একটি মুখের মিষ্টি কথা তাঁদের এমনি পরিণামের হাত থেকে বাঁচাতে পারতো।

এর পরে দেখা যায় গুপ্ত আক্রমণ। তাসের আড্ডায়, বা অফিসের টিফিন-রুমে, বা নিজের বিধবা বোন বা আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে, স্বামী সংগ্রহ করেন, স্ত্রীর বিরুদ্ধে গুটিকতক অভিযোগ। এই সমস্ত অভিযোগ তিনি প্রকাশ করেন, যখন তিনি দেখেন তাঁর কোনও ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁর স্ত্রী নিজের কোন প্রিয় কাজ করছেন। অমনি তিনি অভিযোগের বাণ ছুড়লেন স্ত্রীকে নিরস্ত করতে। স্ত্রী নিরস্ত হলেন বটে, কিন্তু মনেতেও খেলেন দারুণ ধাক্কা।

অপর দিকে অনেক স্ত্রীলোককে দেখেছি, বিয়ের পরেই তাঁরা খুঁজে বেড়ান, স্বামীর অতীত জীবনের ঘটনা। এবং তেমন কোনও ঘটনা মনের মত না পেলে, কোনও একটা ঘটনাকে বিকৃত রূপ দিয়ে, স্বামীর বিরুদ্ধে তিনি অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেন। তিনি ভাবেন, এতেই বুঝি তাঁর জয়! অনেক সময় তেমন কোনও ঘটনা না পেলে নিজের মায়ের চোখে স্বামীকে বিচার করে, ছুড়লেন তাঁর অস্ত্র।

দৃষ্টান্ত হিসাবে ধরা যাক।

রামবাবু সাবিত্রীকে বিয়ে করেছেন সুন্দরী বলে। সাবিত্রী গরিবের মেয়ে। কোনও কারণে বিয়ের সময় সাবিত্রীর মায়ের সঙ্গে রামবাবুর মায়ের মন-কষাকষি হয়েছে। ফলে, সাবিত্রীর

মা গেছেন চটে রামবাবুদের ওপর। রামবাবু ভালো মানুষ, একটু লাজুক প্রকৃতির। প্রথম শ্বশুরবাড়ি গিয়ে তিনি শালা-শালীদের সঙ্গে কোন কিছু কথা বলছেন না। খেতে বসেও সেই একই ব্যাপার। অনুরোধ-উপরোধ সত্ত্বেও, "পেট ভরে গেছে" বলে তিনি উঠে পড়লেন। জামাই পেছন ফিরতেই সাবিত্রীর মা মেয়ের সামনেই দাঁতে দাঁত ঘষে বললেন—"কি দাম্ভিক ছেলে রে বাবা। যেমনি মা, তার তেমনি ছেলে হবে তো! কি তেজ না দেখিয়ে গেল, আমরা গরিব বলে!"

সংসারে অনভিজ্ঞা সাবিত্রী, মায়ের কথা শিরোধার্য ক'রে ধ'রে নিল তার স্বামী দাম্ভিক। ফলে শুরু হলো স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির পালা। ফলে, দাম্ভিক না হয়েও, রামবাবু হলেন দাম্ভিক, আর সাবিত্রীর নিজের কাছের মানুষটি বুকের কাছে না এসে দিন দিন চলে গেল আরও দূরে সরে। ফলে শুরু হলো loneliness বা নিঃসঙ্গতা।

আর এক ধরনের স্ত্রী বা পুরুষ দেখা যায়, যাঁরা হন সর্ববিষয়ে পারদর্শী। কোনও পক্ষ যদি মুখ খোলে, অমনি অপর পক্ষ তা বাজে যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করেন। যেমন, রামবাবুর স্ত্রী শাড়ির বায়না ধরেছেন, বললেন latest design-এর কাপড় চাই। শাড়ির দোকানে গিয়ে তিনি মনোমত একটি শাড়ি বাছলেন। রামবাবু তৎক্ষণাৎ হেসে বললেন—"ইস্, এ তো একেবারে সেকেলে।" কিংবা, রামবাবুর অনুপস্থিতিতে তাঁর স্ত্রী একটা শাড়ি নিজেই কিনে বসেছেন। সন্ধ্যের পর, সেই শাড়ি পরে রামবাবুর সামনে হাসিমুখে উপস্থিত হলেন, মনে আশা, রামবাবু দেখে প্রশংসা করবেন। কিন্তু রামবাবু নাক সিটকে বললেন —"এই ভূতের মত শাড়িটা তোমায় কে কিনে দিলে?

এক্ষুনি বদলে এসো। তোমাকে একেবারে ডাইনীর মত দেখাচ্ছে।"

মুখ ভার করে তিনি সেই যে চলে গেলেন, আর ঘণ্টা দু-একের মধ্যে রামবাবুর কাছেই এলেন না।

অনেক সময় দেখা যায়, এক পক্ষ যৌন-তাড়নায় অপর পক্ষকে কেবল সুন্দরই দেখছেন। এই সুন্দর দেখার ফলে, কেবলই তিনি তাকে কাছে পেতে চান। কিন্তু তখন অপর পক্ষের যে আর কোন মানসিক চাহিদা থাকতে পারে তা তিনি ভুলে যান। যেমন—রামবাবুর স্ত্রীর সিনেমায় যেতে ইচ্ছে হয়েছে, অথচ রামবাবু চান স্ত্রী তাঁর কাছে এই সময়টা থাকুন; কিংবা রামবাবু চান ক্লাবে, তাসের আড্ডায় বন্ধুদের কাছে যেতে, কিন্তু স্ত্রীর বাসনা সে সময় স্বামীকে আলিঙ্গন আর চুম্বনের মাঝে বেঁধে রাখতে। তিনি ভেবেও দেখতে চান না যে তাঁর স্বামীর স্ত্রীলোক ছাড়া অন্য কিছু কামনা থাকতে পারে। ফলে, প্রেমের বাঁধন প্রথমে হয় লৌহ-বাঁধন, পরে সাপের আকার ধারণ করে গণ্ডদেশে ছোবল মারে।

সুতরাং এ থেকে পরিষ্কার আমরা বুঝতে পারছি, কোনও ব্যাপারেই বাড়াবাড়ি ভাল নয়। সব কিছু মানিয়ে গুছিয়ে নিলে সংসার হয়ে ওঠে সুখের, আর সেখানে সমীক্ষক বা Psychologist-এর কোনও প্রয়োজনই হয় না।

ছেলে মানুষ করার ঝকমারি

এই তো মাত্র সেদিন এক বন্ধু এসেছিলেন, আমার সঙ্গে দেখা করতে চেম্বারে। একথা সেকথার পর বন্ধুকে বলি—আছ কেমন ?

বন্ধু বলেন—আর ভাল থাকতে পেলাম কই ! ছেলে-মেয়েগুলো কি ভাল থাকবার জো রেখেছে ! বড় ছেলে, আমার অমতে বিয়ে করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে। আর ছোট ছেলেটা কাউকে কিছু না বলে বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছে। আর বাড়ি বিক্রি করে মেয়েটার বিয়ে দিলাম—সেও সেখানে নিজেকে মানিয়ে থাকতে পারলে না। তা হলেই বুঝতে পারছ কেমন আছি ?

আজকালকার ছেলেমেয়েদের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ করে যেতে লাগলেন তিনি আপন মনে। আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে হঠাৎ তিনি বললেন—একি, তুমি একটাও কথা বলছ না যে ?

আমি বলি—কি বলব বল ? মানসিক ডাক্তার আমি, মন নিয়েই আমার কারবার, তাই আমার কথাগুলো যদি তোমার মনঃপূত না হয় !

বন্ধু কেমন যেন থতমত খেয়ে গেলেন ! বলেন—তোমার মতে কি আজকালকার ছেলেমেয়েদের কোন দোষ নেই ? তাদের এ সমস্ত হঠকারিতা আমাদের মুখ বুজে সমর্থন করতে হবে ?

আমি বলি—তা নয় ! তবে কি জানো, আজকালকার ছেলেমেয়েদের হঠকারিতার জন্যে দায়ী হচ্ছি আমরা নিজেরা।

বন্ধু বলেন—তার মানে? আমরা কি তাদের এইরকমই শিক্ষা দিয়েছি যে বড় হয়ে বাপ-মা'র অবাধ্য হতে এবং নিজের ইচ্ছামত কাজ করতে?

আমি বলি—তা নয়। তবে কি জানো, আমরা, অর্থাৎ বাপ-মা'রা ছেলেমেয়েদের মনে করি, আমাদের ইচ্ছে মতন কাজ করতে তারা বাধ্য। যদি না করে, তা হলে রেগে গিয়ে তাদের মারধোর করি। সময়ে সময়ে প্রচণ্ড ভাবেই করি, ফলে তখন-কার মত তাদের স্বাধীন ইচ্ছে তারা দমন করলেও সুযোগ আর সুবিধে পেলেই তা প্রকাশ করবেই।

বন্ধু বলেন—বল কি? এত কষ্ট করে যাদের খাওয়ালুম, পড়ালুম, মানুষ করলুম তারা এরকম ব্যবহার করবে?

আমি বলি—যুক্তি দিয়ে কোনও জিনিস বুঝতে তাদের তো আমরা শেখাই না! তার ফলে হয় কি, তারা যখনই একটু স্বাধীনতা পায়, তাদের মনই তখন গুরু হয়ে বসে। আর তার ফলে কত ছেলেমেয়ের জীবন যে নষ্ট হয়ে যায় তার কথা আর কি বলব! সময় সময় মানসিক রোগও তাদের আক্রমণ করে।

বন্ধু বলেন—তা কখনই হতে পারে না।

আমি বলি—হতে পারে কি, পারে না, তবে শুনবে আমার কয়েকটা অভিজ্ঞতার কথা? বলি শোন।

কয়েকদিন আগে এক ভদ্রমহিলা এলেন আমার কাছে তাঁর বারো বছরের একমাত্র ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে। ভদ্রমহিলা এম. এ. পাস। কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে আমাকে বলেন—ডাক্তার-বাবু, আমার একমাত্র ছেলেকে আপনাকে ভাল করে দিতে হবে।

আমি প্রশ্ন করি—কি হয়েছে আপনার ছেলের?

ভদ্রমহিলা বলেন—মাসখানেক ধরে ওর কেবলই 'ফিট' হচ্ছে। কোন কিছু বললে, বুঝতে পারে কিনা বোঝা যায় না।

আমি ছেলেটির দিকে চেয়ে দেখি, ছেলেটির চেহারা সুন্দর কিন্তু দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত।

আমি কাছে ডাকলাম, সে কেমন যেন ভয় পেল! পকেট থেকে একটুকরো চকলেট বার করে তার দিকে এগিয়ে দিলাম। ছেলেটি ধীরে ধীরে আমার কাছে এল। কিন্তু শত চেষ্টা করা সত্ত্বেও তার মা'র সামনে কথা বলাতে পারলাম না। ভদ্র-মহিলাকে প্রশ্ন করি—এ কি বরাবরই এরকম করে?

ভদ্রমহিলা বলেন—না। আগে বেশ ভালই ছিল। স্কুলে ক্লাসে বরাবর সে ফার্স্ট'ই হোত। খুব বাধ্য ছেলে ছিল আমার। কিন্তু ক্রমশঃ কি যে হোল, পড়তে বললে পড়াশুনা করতো না, গুম হয়ে চুপচাপ বসে থাকতো। তারপর বই নিয়ে আমাকে বসতে দেখলেই ঘর থেকে ছুটে বের হয়ে গিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতো, শত ডাকা সত্ত্বেও কাছে আসতো না। তারপর কথা বলা বন্ধ করলো। প্রথমটা ভেবেছিলুম বদমায়েসী। এই পর্যন্ত বলেই ভদ্রমহিলা চুপ করলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—আপনি কি খুব মারধোর বা বকাবকি করতেন?

ভদ্রমহিলা বলেন—তা নইলে কি ছেলেকে মানুষ করা যায়? ভাল ছেলে, যদি না শাসন করি, দিনরাত তো খেলাধুলো করেই সময় কাটাবে। পড়াতে মনই দেবে না। তাই—

ভদ্রমহিলাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়ে আমি বলি—এর বন্ধুবান্ধব নেই? তাদের সঙ্গে কেমন মেলামেশা করে?

ভদ্রমহিলা আরও বিস্মিত হয়ে গিয়ে বলেন—বন্ধুবান্ধব?

পাড়ার বকাটে ছেলেদের সঙ্গে মিশলে সে যে নষ্ট হয়ে যাবে! তাই ওকে কি আর মিশতে দিতে পারি!

আমি বুঝতে পারি ছেলের রোগের কারণ কোথায়।

আমি বলি—দেখুন, ছেলেমানুষ; ওকে ওর বয়সী ছেলেদের সঙ্গে মিশতে দেবেন। তাহলে বোধ হয় ওর রোগ আপনিই অনেকটা সেরে যাবে!

ভদ্রমহিলা বলেন—না না, ডাক্তারবাবু, এ কখনই হতে পারে না। অন্য ছেলেদের সঙ্গে মিশলে, ও ভাল হতে তো পারবেই না বরং বকাটে হয়ে একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে। এ আমি প্রাণ থাকতে কখনও হতে দিতে পারব না! আপনি বরং কোনও ওষুধ দিয়ে ওকে সারিয়ে দিন।

আমি বলি—ওষুধ শরীরের রোগ সারাতে পারে, মনের রোগ কি ওষুধে সারে?

ভদ্রমহিলা সেই যে আমার চেম্বার থেকে বেরিয়ে গেলেন আর ফিরে এলেন না। কিছুদিন আগে খবর পেয়েছি ছেলেটি রয়েছে একটি মানসিক হাসপাতালে।

বন্ধু বলেন—বল কি হে, এতদূর?

আমি বলি—শুধু এই নয়, আরও শোন। সেদিন এক ভদ্রলোক এলেন তাঁর সাত-আট বছরের ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে। ছেলেটি জন্ম থেকেই কেমন ক্যাবলাকান্ত। কোনও জিনিস মনে রাখতে পারে না, দু'তিন বছরের শিশুর মত ব্যবহার করে। কিছুতেই বয়স অনুযায়ী ব্যবহার করে না। এমন হওয়ার কারণ কিছুই বুঝতে পারলাম না। অনেকক্ষণ পরীক্ষা করবার পর দেখলাম, ছেলেটি তার বাপের কাছে এগিয়ে যেতে ভয় পায়। খবর নিয়ে জানতে পারলাম, ছেলেটির যখন তিন বছর বয়স

তখন নাকি একদিন, নিজের রাগ সামলাতে না পেরে, ভদ্রলোক তাকে বেজায় প্রহার করেছিলেন। তার পর থেকেই ছেলেটি নাকি অমন হয়ে যায়। তাঁদের ধারণা—ছেলেবয়সে মারের সময় ছেলেটির ব্রেনে লেগে গিয়েছিল, তাই ছেলেটি অমন হয়ে গিয়েছে।

ব্রেন পরীক্ষা করলাম, কিছুই পেলাম না। বুঝলাম মারের আর বকুনির ভয়ে ছেলেটির মন দেহের সঙ্গে বাড়তে পারেনি, মারটা ব্রেনে না লেগে লেগেছে মনে। তাই এই পরিণাম।

আর একটা ঘটনা বলি তোমাকে। তেইশ-চব্বিশ বছরের একটি ছেলে এল আমার কাছে চিকিৎসিত হতে। কিছু ভাল লাগে না তার! কাজকর্ম ভাল ত লাগেই না, এমন কি কোন ছেলেমেয়ের সঙ্গও তার কাছে বিষের মত মনে হয়। এর কারণ খুঁজে পাই না। কিন্তু কেমন যেন লক্ষ্য করি ছেলেটির ব্যবহারের মধ্যে অস্বাভাবিকতা আছে। মেয়েদের মত তার চালচলন, ইনিয়ে বিনিয়ে কথা বলে, ইচ্ছে করে গলার স্বর মেয়েদের মত সরু করে, এক কথায় পুরুষ হয়েও যেন ভঙ্গিতে মেয়েলী আচরণ করে। দু-চার দিন সিটিং দেবার পর বুঝতে পারি, ছেলেটির মা ছেলেবয়সে ছেলেটিকে নিজের আঁচলের নীচে রেখেছিলেন। ফলে ছেলেটি মাকেই আদর্শ করে বেড়ে উঠেছে। দেহে যৌবনের আবির্ভাবে সতেজ পৌরুষ না এসে এল নারীত্ব। মায়ের মৃত্যুর পর সে সংসারে হল বন্ধুহীন অচল। এমন কি স্ত্রীলোকও তার কাছে হয়ে ওঠে বিষ। আর মজার ব্যাপার এই যে, মেয়েদের ক্রমাগত নকল করার ফলে, কোন মেয়ের মন সে জয় করতে পারে না। শুরু হল তার মানসিক নিঃসঙ্গতা। কাজের মধ্যে দেখা দিল অবসাদ। তার জীবন তারই নিজের মা

দুর্বিষহ করে দিয়ে গেছেন—এর চেয়ে দুঃখের কথা আর কি হতে পারে? অজ্ঞতার ফলে ছেলের ভাল চাওয়া সত্ত্বেও মা'র কাজে ছেলের ক্ষতি হয়ে গেল।

শুধু এই নয়, আরও একটা ঘটনা বলি।

এক নববিবাহিত ভদ্রলোক এলেন, তাঁর মানসিক রোগের চিকিৎসা করাতে।

তিনি বলেন—বিবাহের পর থেকে তিনি লক্ষ্য করেছেন, তাঁর স্ত্রী যখনই কিছু কথা বলতে বলেন তখনই তাঁর সব কথা যেন ফুরিয়ে যায়। নবপরিণীতা বধূ স্বামীকে "কথা বল" বলে যতই অনুরোধ করেন, স্বামী ততই নির্বাক, বোবা হয়ে থাকেন।

এই ভাবে কিছুদিন কাটার পর ভদ্রলোকের স্ত্রী করলেন বিদ্রোহ। স্বামীর বিরুদ্ধে নানা ধরনের কড়া কথা বলতে লাগলেন।

ভদ্রলোক প্রতিবাদ করবেন মনে করেন, কিন্তু একটা কথাও বলতে পারেন না। নীরবে স্ত্রীর সবটুকু বিষই হজম করেন। অথচ রাত্তির বেলায় ঘুমন্ত অবস্থায় তিনি প্রত্যহই স্বপ্ন দেখেন, তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে তুমুল ঝগড়া হচ্ছে, আর জেগে থেকে যে কথা তিনি মুখেও আনতে পারেন না, তা অবলীলাক্রমে বলে যাচ্ছেন।

অনেকদিন 'সিটিং' দেবার পর আমি জানতে পারি, ভদ্রলোকের বাপ-মা ছেলেবয়সে ভদ্রলোককে কথা বলবার সুযোগ দিতেন না। কেবল ভদ্রতা রক্ষার জন্য যেটুকু কথা বলার প্রয়োজন সেইটুকুই শুধু বলতে পেতেন। ওপরপড়া হয়ে বা শিশুসুলভ চপলতা হিসাবে যদি কোন কথা বলতে যেতেন, তাহলেই তাঁর বাপ-মা বলতেন—তুমি ছেলেমানুষ, বড়দের কথায়

না থাকাই ভাল। কিংবা,—ডেঁপোর মতন কথা না বললেই নয়!

ফলে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে ভদ্রলোকের কথা বলার উৎস একেবারে শুকিয়ে গেল। আজ তাই কেউ কোন আঘাত করলে প্রত্যাঘাত করবার ক্ষমতাটুকুও পর্যন্ত তিনি হারিয়েছেন। শুধু তাই নয়, শিশুবয়সে এই ধরনের ব্যবহার পেয়ে উত্তরজীবনে অনেকে হয়ে যান তোতলা। মনের ইচ্ছেটুকু পূর্ণভাবে প্রকাশ করার শক্তিও তিনি হারিয়ে ফেলেন। আবার ঠিক ঐ একই কারণে দেখা যায় শান্ত মানুষ হয়ে ওঠেন অত্যন্ত অশান্ত। কেউ কোন কথা বললে, তিনি তার জবাব দেন, আঘাত করে। অকারণে বিদ্রূপাত্মক কথা শুনে শুনে মানুষ তাঁকে এড়িয়ে চলে অথবা প্রচণ্ড জোরে আঘাত করে তাঁকে একেবারে গুঁড়িয়ে দেয়। কোন লোকের সঙ্গে বনিয়ে চলার শক্তিটুকুই তিনি হারিয়ে ফেলেন। এর চেয়ে দুঃখের আর কি হতে পারে বল?

আর একবার একটি মেয়ে এসেছিলেন আমার কাছে। শ্বশুর-বাড়িতে তোমারই মেয়ের মত কারুর সঙ্গেই তিনি বনিয়ে চলতে পারতেন না। অবস্থা তিক্ত হতে হতে এমন জায়গায় এসে পৌঁছোয় যেখানে তিনি স্বামীর ঘর ছেড়ে আসতে বাধ্য হন। শেষের দিকে তাঁর স্বামীকেও তাঁর ভাল লাগতো না। শ্বশুরবাড়ি তাঁর কাছে হয়ে ওঠে শত্রুপুরী। অথচ বাপের বাড়িতে কি করে থাকেন? একটা মানসম্মান আছে তো?

দু-একদিন 'সিটিং' দেবার পর বুঝতে পারি ভদ্রমহিলার মা-ছেলেবয়েস থেকেই মেয়েকে ঘিরে রেখেছিলেন। কারুর সঙ্গে মিশতে দিতেন না। স্কুলেও যেতে দেননি। ফলে মেয়ে মানুষ হয়েছে নিজের কল্পনারাজ্যে।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মেয়ের মনের পরিপুষ্টির জন্য যে সমস্ত জিনিসের প্রয়োজন তা কিছুই তার জীবনে হয়নি। এমন কি প্রেমের কথা আছে বলে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র বা বঙ্কিমচন্দ্রের একখানা বইও তাকে পড়তে দেওয়া হয়নি। সিনেমা, থিয়েটার দেখা তো দূরের কথা। ফলে হোল কি, ভদ্রমহিলার মধ্যে যৌন-বৃত্তি স্বাভাবিক কারণে জাগলেও পরিপুষ্টতা লাভ করতে পারলো না। তাই স্বামীও তাঁর আপন হোল না। অবসাদ-রোগগ্রস্ত হয়ে তিনি দিন কাটাতে লাগলেন।

বন্ধু বলেন—তোমার কথায় পরিষ্কার বুঝতে পারছি, ছোট ছেলেমেয়েদের মারধোর বা বকুনি দেওয়া উচিত নয়। তার সমবয়সী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মিশতে দেওয়াও উচিত। এ ছাড়া, বাপ-মা'র আর কি করণীয় আছে?

আমি বলি—দেখ, বাপ-মা'র করণীয় এখনও অনেক কিছু আছে। আর একটা ঘটনা বলি:

একবার আমার কাছে একটি দশ-এগারো বছরের ছেলে আসে চিকিৎসিত হতে। ছেলেটির লেখাপড়ায় মাথা আছে। কিন্তু অসম্ভব রাগী। আর, সেই বয়সেই সে মেয়েদের সম্বন্ধে খুবই ওয়াকিবহাল।

কারণ অনুসন্ধান করে জানতে পারি, ছেলেটির বাপ-মা অত্যন্ত ঢিলেঢালা প্রকৃতির। ফলে ছেলের সামনে নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি, ঠাট্টা, ইয়ার্কি করেন। শিশুর ঔৎসুক্য তা দেখে বাড়ে।

রাত্রিতে ঘুমের ভান করে বিছানার ওপর পড়ে থেকে সে বাপ-মা'র যৌনসংসর্গও লক্ষ্য করে। ফলে, পুরোপুরি জিনিসটা বুঝতে না পারলেও একটা ভাসা ভাসা ধারণা শিশুবয়সেই তার

হয়ে যায়। পরে বন্ধু বা বান্ধবীর মধ্যে তার প্রকাশ দেখা যায়। শাসন করতে গেলে তা তখন রাগের আকারে প্রকাশ পায়। কারণ যখন সে বুঝতে পারে এধরনের কাজ তাকে অন্যায়ের পথে নিয়ে যাচ্ছে তখন তার রাগ আসে নিজের উপর, এবং সেই রাগেরই প্রকাশ দেখা যায় অপরের উপর। এইটাই বাড়তে বাড়তে ছেলেটির নৈতিক চরিত্রের অবনতি ঘটে কিংবা ছেলেটি অত্যধিক রাগী হয়ে যায়। পরে একসময় ছেলেটি excitement বা উত্তেজনার রোগগ্রস্ত হয়। বাকী জীবনটা তার কাটাতে হয় মানসিক হাসপাতালে।

বন্ধু বলেন—বল কি হে ?

আমি বলি—হ্যাঁ ভাই, কথাগুলি অত্যন্ত সত্য। ছেলে মানুষ করার মত দুরূহ কাজ বোধ হয় আর কিছুই নেই। কারণ তুমি সব সময় জেন, ছোট্ট দুটি মিটমিটে চোখ সদাই তোমাকে অনুসরণ করছে।

আরো বলি, ছেলেমেয়েদের সামনে বাপ-মা অনেক সময় নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি করেন। ছেলেরা তা একমনে লক্ষ্য করে। অভিভাবকেরা তা বুঝতে পারেন না বটে কিন্তু ভবিষ্যতে এর বিষময় ফল ফলে। ধীর শান্ত মেয়ে হয়ে ওঠে মুখরা, মাতৃভক্ত ছেলে সেই ঝগড়াকে স্বাভাবিক মনে করে অপরকে অকারণে আঘাত দেয়। এই ভাবে চলার ফলে সংসারে স্বাভাবিক ভাবে বনিয়ে চলার শক্তিটুকুও সে হারিয়ে ফেলে। ফলে যখন বড় হয়, তারা হয় নিঃসঙ্গ। ইচ্ছা থাকলেও কারো সঙ্গে সহজভাবে কথা বলতে তারা পারে না। এই সমস্ত কারণে নানা দিক থেকে আমরা সমাজে ভাঙ্গন দেখতে পাচ্ছি। তাই বলি, এর জন্যে দায়ী কি তারা, না আমরা নিজেরা।

তাই সব সময়ে মনে রেখ তোমার প্রত্যেকটা ভুল-ভ্রান্তি, দোষ-গুণ সে নির্বিচারে তার জীবনে গ্রহণ করবে। শুধু তাই নয়, শিশুরও মন বলে একটা পদার্থ আছে। সারাজীবনে আমরা যা শিখি তার অধিকাংশ আমরা শিখি যখন আমাদের বয়স এক বছর থেকে দুই বছরের মধ্যে, তৎটা শেখা জীবনে আর কোন সময়ে এক বছরের মধ্যে শিখতে পারি না। সেইজন্য তার মনের পরিপুষ্টির জন্য ঐ বয়সে সদাসর্বদা তোমায় চেষ্টা করতে হবে, আর সমবয়সী ছেলেমেয়ের দ্বারা তার মনকে বাড়তে সাহায্য করতে হবে। কোন কিছু শেখাতে গেলে, ভালবেসে যুক্তি আর বিচার দিয়ে তাকে বোঝাতে হবে। আর তা নিজের জীবনে অভ্যাস করে দেখিয়ে দিতে পারলে সব চেয়ে ভাল হবে।

উপদেশ তারা শুনতে চায় না বা বুঝতেও পারে না। যেমন ধর, বাপ-মা ছেলেমেয়েকে বারণ করছেন, সিনেমা দেখতে। অথচ নিজেরাই ছুটির দিন হলে সিনেমায় যাচ্ছেন। তাঁদের সন্তান কিছুতেই বিশ্বাস করবে না যে, তাদের বয়সে সিনেমা দেখা অন্যায়।

প্রথমটা সে চেষ্টা করবে কোন ফাঁকে সিনেমা দেখবার। পরে বাপের পকেট থেকে বা মায়ের বাক্স থেকে পয়সা চুরি করে সে সিনেমা টিকিটের দাম যোগাড় করবে। ফলে চৌর্যবৃত্তি তার মনের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠবে। অথচ, আমি স্থির বিশ্বাসে জানি, কোন বাপ-মা-ই চান না তাঁদের ছেলে চোর হয়ে উঠুক।

এই রকমভাবে বিচার করলে দেখা যায়, বহু দোষ বাপ-মা'র কাছ থেকে শিশুর চেতন বা অবচেতন মনের ওপর সংক্রামিত হয়, যার বিষময় পরিণাম সে সারা জীবন ধরে বয়ে চলে। এর জন্যে দায়ী কে?

বন্ধু বলেন—দেখ ভাই, তোমার কথা শুনে আমার রীতিমত ভয় করছে। আজ বুঝতে পারছি আমার বড় ছেলে কেন আমার অমতে বিয়ে করেছে। আজই তাকে ফিরিয়ে আনবার ব্যবস্থা করব নিজের বাড়িতে। মেয়েটাকেও বোঝাবার চেষ্টা করব, স্বামীর ঘরই তার আপন ঘর। আজ তা হলে উঠি ভাই—

বন্ধু বিদায় নেন সেদিনের মত।

ক্ষমা কর, ধৈর্য ধর

"ধৈর্য ধর, ধৈর্য ধর, বাঁধো বাঁধো বুক"—

কথাটা আমার কাছ থেকে শুনেই চটে যাবেন না। ভাবছেন কয়েকটা প্রবন্ধ লিখেই আমিও বুঝি খুব বড় সাহিত্যিক বনে গেছি! তাই ভাওয়ালের কবি গোবিন্দ দাসের কথা দিয়ে আমি বুঝি কোন নতুন সাহিত্যের সৃষ্টি করবার চেষ্টা করছি।

যে কথা একদিন সাহিত্যসৃষ্টির জন্যে লেখা হয়েছিল, তা আজ অত্যন্ত প্রয়োজন হয়েছে মানুষের সামাজিক জীবনযাত্রায়। ঐ ছোট্ট কথাটির অভাবে কত লোকের জীবন যে দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে, মানসিক ডাক্তার হিসেবে আজ সেই কথাই বলব। তাই এই প্রসঙ্গের অবতারণা করছি।

আমার এক বন্ধুর ছেলে বাড়ির কাছেই কাপড়ের দোকান করেছে। দু-একবার অনুরোধও করে গেছে তার দোকান থেকে আমার প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো কেনবার জন্যে। তখন প্রয়োজন ছিল না, তাই যাওয়া আর হয়নি।

মনে মনে সে কি ভেবেছিল জানি না। মাস চার-পাঁচ পর হঠাৎ আমি একদিন তার দোকানে গেলাম। কয়েকটা বিশেষ ধরনের জিনিস দেখতে চাইলাম।

ছেলেটি কেমন যেন ভুরু কুঁচকে দু-একটা জিনিস সামনে এনে দিল।

আমি আরও কয়েকটা জিনিস দেখতে চাওয়াতে উত্তরে সে বলল—এই যা আছে তাই, নিতে হয় নিন, নইলে—

নইলে যা তা' আমি বুঝতেই পেরেছিলাম। দোকান

থেকে বেরিয়ে গাড়িতে এসে উঠে বসলাম, ভাবতে লাগলাম ছেলেটি এমন ব্যবহার করলো কেন ?

তখনই মনে হল, ছেলেটি অমন ব্যবহার করলো তার কারণ, সেদিন যখন সে আমাকে তার দোকানে ক্রেতা হিসাবে আশা করেছিল, তখন সে আমাকে পায়নি। তাই তার ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে। আর তার ফলেই সে আজ হারালো খুব কম করে হলেও তিন-চারশো টাকার খদ্দের।

আর একটা দিনের কথা বলি। সেদিন আমার ড্রাইভার আসেনি। গাড়িও তাই হল অচল। অগত্যা সরকারী বাসে বাদুড়-ঝোলা হয়ে যেতে বাধ্য হলাম। কারণ তখন সেখানে লেগেছে অফিসযাত্রীদের ভয়ানক ভিড়। ঠেলাঠেলির শেষ নেই। সকলকে যেতেই হবে।

ঠিক এমনি সময় এক ভদ্রলোক বাসে উঠলেন—উঠে, অধৈর্যের মতন ভেতরে যাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু ভেতরে তো তখন তিল ধারণের জায়গা নেই, তিনি যাবেন কোথায় ?

কিছুক্ষণের মধ্যেই লাগলো দ্বন্দ্ব। দ্বন্দ্বের পরিণাম যা হয়,—মারধোর, থানা-পুলিস।

সকলকারই অফিস যেতে হল দেরি।

ভদ্রলোক যদি একটু ধৈর্য ধরে সকলকার সঙ্গে মিলেমিশে যেতেন, তাহলে কারুর পক্ষে হয়তো দেরি হত না।

এর পরে বলি আর এক দিনের ঘটনা। রাত প্রায় সাড়ে নটা-দশটার সময় বাড়ি ফিরছি।

ফাঁকা ট্রাম। বিশেষ লোকজন নেই।

এক ভদ্রলোক হঠাৎ তাঁর নামবার ছুটো স্টপেজ আগেই গিয়ে দাঁড়ালেন দরজার সামনে।

ভদ্রলোককে আমি আগে থেকে চিনতাম। কারণ তিনি আমাদের পাড়ার লোক।

আমি ডেকে বলি—এখনও তো দেরি আছে, তাড়াতাড়ি করছেন কেন ?

উত্তরে তিনি বললেন—না ভাই, একটু তাড়াতাড়ি যেতে হবে।

আমাদের পাড়ার স্টপেজটা আসতেই তিনি লাফিয়ে পড়লেন ট্রাম থেকে। পেছনেই ছিল একটা মোটরগাড়ি। তাতে পড়লেন তিনি চাপা। পরিণামে জন্মের মতন উত্থানশক্তি হারিয়ে বসলেন।

কোর্টে বিচার হল। আমাকেও ডেকেছিল পুলিস থেকে সাক্ষী হিসেবে।

সাক্ষ্যতে আমি বলি—দোষ দুজনকারই। ভদ্রলোক কোন দিক না দেখেই ট্রাম থেকে লাফিয়ে পড়েছিলেন। কারণ, তিনি হয়েছিলেন অত্যন্ত অধৈর্য। আর ড্রাইভারের পক্ষেও দোষ ছিল, ট্রামগাড়িটা ভাল করে না দেখে গাড়ি চালানো।

পাঁচ সেকেণ্ড কি দশ সেকেণ্ড পরে গাড়ি চালালে এমন কিছু ক্ষতি হত না। এ ধরনের ঘটনা ঘটে দুপক্ষেরই অধৈর্যের ফলে।

আপনারা বলবেন, এসব তো নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। এর সঙ্গে মানসিক ডাক্তারের কি সম্বন্ধ আছে ?

আমি বলব, এই অধৈর্যের পরিণাম, আমি জীবনে যা দেখেছি, তার বুঝি তুলনা হয় না।

এই "ধৈর্য"রূপ গুণটি একটি মানসিক বৃত্তি। তাই "মনের" মতন একে দেখা যায় না। যদি দেখানো যেত তাহলে আমি আপনাদের দেখাতাম, যে ব্যক্তি জীবনে প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন তাঁর ধৈর্য কতখানি!

আর যিনি বলেন—আমার জীবনে কিছু হল না, কারণ আমার জীবনে backing নেই, backing থাকলে একবার দেখিয়ে দিতাম—তাঁর ধৈর্য কত কম।

একথা হয়তো সত্যি, মেধা আর বুদ্ধিতে দু'জনেই সমান। কিন্তু ঐ একটি বস্তুর অভাবে সামাজিক জীবনে দু'জনার মধ্যে ঘটে যায় কতখানি পার্থক্য।

এখন বলি আমার কয়েকটি রুগীর কথা। একজন এলো, বড়লোকের ছেলে। জীবনে দুঃখের কোন কারণ নেই। বিয়েথাও করেনি যে কারুর সঙ্গে দিনরাত ঝগড়া হচ্ছে। তবুও সে শান্তি পাচ্ছে না, রাস্তায় বেরুলেই মনে হয়, বেঁচে থেকে কি লাভ? ঐ যে মোটর আর বাস যাচ্ছে, তার তলায় ঝাঁপিয়ে পড়লেই হয়।

"সাইকোলজিতে" মনের এই অবস্থাকে বলে—"Accident proneness". কিন্তু এই জিনিসটি ওঠে কেন? এরও জন্ম সেই অধৈর্য থেকেই।

নানা কথা তাকে বলি, বোঝাবার চেষ্টাও করি, কিন্তু ছেলেবয়স থেকে ধৈর্য না ধরে আজ সে এমন অবস্থায় এসে উপস্থিত হয়েছে, আমার কথাগুলোও সে শুনতেও চায় না।

আমি হয়তো বলছি এক কথা, ঠিক সেই সময় সে অপর কথা চিন্তা করছে। ফলে, বিশেষ কোন উপকার আমার "সিটিংএ" তার হচ্ছে না।

আমি তার আত্মীয়স্বজনকে বলি—একটু সাবধানে রাখবেন রুগীকে। অবশ্য আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করছি।

আত্মীয়স্বজনেরও বোধ হয় গালাগালি খেয়ে খেয়ে ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছিল। কারণ, একদিন হঠাৎ খবর পেলাম—ছেলেটি চারতলার ওপর থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছে।

বড় দুঃখ হল; কিন্তু আমি নিরুপায়।

একবার একটি অবিবাহিতা মেয়ে এলো আমার কাছে। কিছু ভাল লাগে না। কলেজে গিয়ে পড়াশুনা করতেও সে চায় না।

মেয়েটি একবার ম্যাট্রিকুলেশন ফেল করেছে, পরের বছর অনেক কষ্টে তৃতীয় বিভাগে পাস করেছে। বাপ বিয়ে দিতে পারছেন না। মেয়েটি কিন্তু কলেজে যেতেও নারাজ।

দু-একদিন সিটিং দেবার পর জানতে পারলাম, ছেলেবয়স থেকে মেয়েটি ধৈর্য কোনদিন অভ্যাস করেনি। ফলে বারো-তেরো বছর বয়স থেকে মনের মধ্যে যৌনপ্রবৃত্তি জেগে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই মেয়েটি আশা করেছিল, তার বাপ তার বিয়ে দেবেন।

দু-এক বছর অপেক্ষা করার পর মেয়েটি যখন বুঝতে পারলো শীঘ্র তার বাপ বিয়ে দিতে পারবেন না, তখনই সে নিজে বারান্দা আর ছাদে উঁকিঝুঁকি মেরে বর খোঁজবার চেষ্টা করতে লাগলো।

দু-একটা বখাটে ছেলে যে জুটলো না তাও নয়, কিন্তু প্রেমের ধোপে বুঝি টেকে না! কাউকে অপছন্দ করে অশিক্ষিত বলে, কাউকে অপছন্দ করে বিড়ি খায় বলে, কাউকে বা অপছন্দ করে কুৎসিত দেখতে বলে।

সম্প্রতি মেয়েটি একটি বর ঠিক করেছে। ছেলেটি দেখতে সুন্দর। পড়াশুনা? সেকেণ্ড ক্লাস ফার্স্ট ক্লাস অবধি হবে।

আমি বলি—তুমি যে ছেলেটিকে ভালবেসেছ তার প্রমাণ? কতদিনের পরিচয় তোমাদের?

মেয়েটি বলে—কতদিনের আর, এই মাসখানেকের।

—কি করে পরিচয় হল তোমাদের?

—চিঠির ভেতর দিয়ে। বারান্দায় আমি একদিন দাঁড়িয়ে ছিলাম, ছেলেটিকে দেখে আমার পছন্দ হল। তারও আমাকে দেখে পছন্দ হয়েছে। কারণ, সে আমায় চিঠি লিখেছে।

আমি বলি—তোমার বাবা-মা একথা জানেন?

মেয়েটি বললো—না, এখনও জানেন না, তবে আমি দু-এক-দিনের মধ্যেই সব কথা তাঁদের বলব।

আমি বলি তাকে—একটু ধৈর্য ধর, এতটা অধৈর্য হয়ো না; কারণ যেটাকে তুমি ভালবাসা বলে মনে করছ সেটা আদৌ ভাল-বাসা নয়। এটা যৌন-তাড়নারই রূপান্তর মাত্র। কয়েকটা মাস এইভাবে কাটালেই তুমি নিজেই অনুভব করবে আজকের ভালবাসা তোমার কোথায় মিলিয়ে গেছে!

মেয়েটি রেগে গিয়ে আমাকে বলে—আপনি মানসিক ডাক্তার, প্রেমতত্ত্বের কি বোঝেন? তার জন্যে আমার বুকের ভেতরটা জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। বুড়ো আপনি, আপনি তার কি বুঝবেন?

আমার শত অনুরোধ মেয়েটি শুনলো না।

বাবাকে বলে বিয়ের ব্যবস্থা করলো। মেয়েটির বাবা আমার কাছে এসেছিলেন বিয়ের নিমন্ত্রণ করতে।

একগাল হেসে তিনি বললেন—ডাক্তারবাবু, দয়া করে অমুক

দিন আমার বাড়িতে একবার পায়ের ধুলো দেবেন। শোভনার বিয়ে কিনা!

আমি কোন কথাই বললাম না। একটু থতমত খেয়ে ভদ্রলোক বললেন—আপনি কোন কথা বলছেন না যে!

আমি বলি—দেখুন, এ বিয়ে দেবেন না। আপনার মেয়ে শোভনা সুখী হবে না।

ভদ্রলোক কেমন হকচকিয়ে গিয়ে বললেন—সুখী হবে না! বিয়ের কথায় তার কি আনন্দ! সমস্ত অবসাদ তার কেটে গেছে।

আমি বলি—কয়েক দিনের মধ্যেই তা দ্বিগুণভাবে দেখা দেবে।

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে ভদ্রলোক বিরক্ত হয়ে বললেন—হ্যাঁ, আপনার "ফীস্" বন্ধ হয়েছে কিনা, তাই আপনি ও-কথা বলছেন!

কিন্তু ক'টা দিন? বিবাহিত জীবনের দুটো মাস কাটতে না কাটতেই স্বামি-স্ত্রীতে শুরু হল ঝগড়াঝাঁটি।

শোভনা আবার অধৈর্য হয়ে নতুন বরের সন্ধান করতে লাগলো। দুশ্চরিত্রা বলে সে শ্বশুরবাড়ি থেকে হল বিতাড়িত।

বাপ আশ্রয় দিলেন, কিন্তু মেয়েকে রাখতে পারলেন না। বাড়ি থেকে সে আর একটি ছেলের সঙ্গে পালিয়ে গেল। ধরা যখন তারা পড়লো, তখন শোভনার জীবনের যেটুকু স্বাভাবিকত্ব ছিল তা নষ্ট হয়ে গেছে। কারণ, উপরি উপরি এই সমস্ত অসামাজিক আচরণ করায় আজ সে আমারই চিকিৎসায় দিন কাটাচ্ছে একটা মানসিক হাসপাতালে।

এইবারে বলি,—অধৈর্যের ফলে কেমন করে সংসার নষ্ট হয়ে যায়, তারই একটা কথা।

এক ভদ্রলোক দিব্যি কাজকর্ম করতেন। দু-একটি ছেলে-মেয়েও হয়েছে। বেশ শান্তিতেই কাটছিল; কিন্তু হঠাৎ শান্তিভঙ্গ হল।

ভদ্রলোকের দেখা দিল অবসাদ-রোগ। কিছু ভাল লাগে না, অফিসের চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন, সংসার অচল। তাঁকে এই কটা মাসের মধ্যে কেউ হাসতে দেখেনি। কোন কিছুর দিকে চাইলে, মিনিট দু-তিনের মধ্যেই চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়ে।

তাঁর স্ত্রী তাঁকে আমার কাছে নিয়ে এলেন। প্রথমটা কিছুই বুঝতে পারি না। ভদ্রলোককে কথা বলতে বলি।

ভদ্রলোক কথা বলতে আরম্ভ করার চেষ্টা করেন, কিন্তু থেমে যান।

হঠাৎ একদিন ভদ্রলোক বলেন—ডাক্তারবাবু, আপনি তো আমায় কথা বলতে বলছেন, কিন্তু বলতে পারেন কী আমি বলব ?

খানিকটা সূত্র পেয়ে আমি অনেকটা চেষ্টা করে বুঝতে পারলাম, ভদ্রলোক ছিলেন একটু কল্পনাবিলাসী। বিয়ের আগে শখের দলে অভিনয়ও করতেন। কেউ তাঁর কথা শুনুক, এইটাই ছিল তাঁর ইচ্ছা।

বিয়ের পর স্ত্রীর হুকুমে ক্লাবে যাওয়া হল বন্ধ। স্বামী স্ত্রীর কাছে যখনই কোন গল্প ফেঁদে বসতে যান, তখনই স্ত্রী বলেন—ওসব চাষাড়ে গল্প শুনে আমার কি হবে, আমার অন্য কাজ আছে।

শত অনুনয়-বিনয়ের পর স্ত্রী যদি কোনদিন গল্প শুনতেন, অধৈর্যের ফলে, অর্ধেক কথা তিনি কানে নিতে পারতেন না। ফলে, গল্পশেষে স্বামী যখন বেশ একটা প্রশংসা আশা করছেন, তখন স্ত্রী সেই না-শোনা কাহিনীকে নিজের কল্পনামত একটা রূপ দিয়ে স্বামীকে সমালোচনার বাণে জর্জরিত করতে লাগলেন।

দু'-একদিন ভদ্রলোক সহ্য করবার চেষ্টা করলেন। মুখ বুজে সহ্য করার ফলে, খুব শীগ্‌গির দেখা দিল তাঁর ব্লাডপ্রেসারের লক্ষণ। এবং এর ফলে দেখা দিল দেহের অবসন্নতা। মন এদিকে আগেই দুর্বল হয়ে পড়েছিল, কিন্তু ওদিকে স্ত্রীর চাহিদারও শেষ নেই। আমাকে এটা কিনে দাও, সেটা কিনে দাও, এটা না হলে সমাজে আমার চলছে না ইত্যাদি আরও সব অসম্মানজনক কথা শুনতে শুনতে ভদ্রলোক হয়ে পড়লেন অক্ষম।

সবচেয়ে আশ্চর্য দেখেছি ভদ্রলোককে আমার কাছে যখন আনা হয়েছে চিকিৎসার জন্য, তখন আমারই সামনে, ভদ্রলোকের বিরুদ্ধে তাঁর স্ত্রী করে চলেছেন নানা অভিযোগ। ফলে ভদ্রলোককে বাড়িতে রাখা গেল না, পাঠাতে হল এক মানসিক হাসপাতালে।

সংসারে দেখা দিল অভাব-অনটন, আর সেই ছেলে দু'টি, যতদূর জানি, মা'র খিঁচুনি খেয়ে খেয়ে একটি হল উন্মাদ, আর একটি হল পকেটমার। কারণ, মা'র রাগ থেকে নিজেকে রক্ষা করবার জন্যে ছেলেটি খুব ছেলেবয়স থেকেই মিশতো নিম্নশ্রেণীর ছেলেদের সঙ্গে। মায়ের এই রাগের কারণও সেই অধৈর্যেরই ফল। অথচ বড় ছেলেটির পাগল হয়ে যাওয়ার কারণ হিসেবে লোকে বললো, বংশের ধারা। কিন্তু আমি হলফ করে বলতে

পারি, বাপ আর ছেলের পাগল হওয়ার কারণ গৃহিণীর অধৈর্য হওয়া।

যদি তিনি একটু শান্ত হয়ে স্বামীকে আর ছেলে দু'টিকে ভালবেসে তাদের স্বাধীনতা দিতেন, তাহলে এমনটি তাঁর ভাগ্যে ঘটতো না। শেষ বয়সে ভগবানকে দোষারোপ করতে আর হত না।

একটি মেয়ে আমার কাছে একবার আসে চিকিৎসিত হতে। মেয়েটির বয়স কুড়ির বেশী নয়। সদ্যবিবাহিতা। বিবাহের পর স্বামী যেই তাকে ভালবেসে আলিঙ্গনে বদ্ধ করতে যান, সঙ্গে সঙ্গে লজ্জাবতী লতার মতন স্ত্রী কেমন যেন সংকুচিত হয়ে পড়ে। কিছুতেই সাহস করে স্বামীর কাছে এগিয়ে যেতে পারে না। প্রতিদানে স্বামীকে চুম্বনও করতে পারে না।

কারণ বুঝতে পারি না। আমার কাছেও মেয়েটি মুখ খুলতে চায় না।

অনেক কষ্টে তাকে কথা বলাই। কথা বলিয়ে জানতে পারি, এই মেয়েটির জীবনে ছেলেবয়সে পড়াশুনা আরম্ভের সময় এক শিক্ষক ছিলেন, যিনি অধৈর্য হয়ে প্রায় ঐ মেয়েটিকে মারধোর করতেন। মেয়েটির মা-বাবাও ভাবতেন কড়া শাসনে মেয়েকে না মানুষ করতে পারলে বুঝি মেয়েটির নৈতিক চরিত্রেরও উন্নতি হবে না।

শিক্ষকটি ছিলেন অত্যন্ত অধৈর্য প্রকৃতির। কিন্তু শিশুদের পড়াতে গেলে যে অসীম ধৈর্যের দরকার তা তাঁর ছিল না।

ফলে মেয়েটি খেল ভয়। আজও তাই কোন পুরুষকে দেখলেই মাস্টার মশায়ের স্মৃতি উদিত হয় নিজের মনে। ভয়ে

মেয়েটি হয়ে পড়ে সংকুচিত। ঐ একই কারণে তার লেখাপড়াও হয়নি।

এদিকে ট্রাট্মেণ্ট চলতে থাকে। প্রথম প্রথম স্বামী আসতেন আমার কাছে, স্ত্রী কবে ভাল হবে তাই জানতে। পরে ধীরে ধীরে আসা কমলো।

একদিন ভদ্রলোক পরিষ্কার ভাবেই আমায় জিজ্ঞাসা করলেন —ও কি কোনও দিনই আর সারবে না, ডাক্তারবাবু ?

আমি বলি—সারবে নিশ্চয়ই তবে দেরি হবে, কবে তা ঠিক বলতে পারা যায় না।

মেয়েটি সুস্থ হয়ে আসছে—হঠাৎ একদিন শুনলাম, ভদ্রলোক ধৈর্য না রাখতে পেরে আবার বিয়ে করেছেন।

প্রেম নাকি অনেকদিনই চলছিল। শুনে তো আমি স্তম্ভিত। শুধু তাই নয়, ভদ্রমহিলার স্বাভাবিকত্ব একেবারে নষ্ট হয়ে গেল, সমাজে রাখাও তাঁকে মুশকিল হয়ে উঠলো। যেতে হল তাঁকে মানসিক হাসপাতালে।

আরও কয়েকটা আমার নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলি।

বাড়ি ফিরতেই একদিন দুপুরবেলা হঠাৎ পাড়ার একজন ভদ্রলোক এসে বললেন—ঘণ্টাখানেক আগে আমার স্ত্রী মারা গেছেন, হঠাৎ হার্টফেল করেছেন। একটা death certificate দিতে পারেন ?

আমি বলি—চলুন। মৃতদেহ দেখে death certificate লিখে দেব।

কিন্তু মৃতদেহ দেখে আমার বেশ সন্দেহ হল। ভদ্রমহিলার

শরীরে পড়ে যাওয়ার একটা সুস্পষ্ট চিহ্ন রয়েছে। তা ছাড়া মুখে-চোখেও ফুটে রয়েছে তখনও একটা আতঙ্কের চিহ্ন।

আমার কেমন যেন সন্দেহ হল। বললাম—সত্যি করে বলুন তো কি হয়েছে? নইলে আমি death certificate লিখব না।

ভদ্রলোক হঠাৎ আমার পায়ে পড়ে বললেন—আমাকে বাঁচান ডাক্তারবাবু, আজ দুপুরবেলা বাড়িতে খেতে এসে হঠাৎ শুরু হয়ে গেল স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া। রাগ সামলাতে না পেরে অধৈর্য হয়ে গিয়ে আমি হঠাৎ মেরে বসলাম এক লাথি। আর তারই সঙ্গে সঙ্গে পড়ে গিয়ে—

ভদ্রলোক কাঁদতে লাগলেন।

কলমটা হাত থেকে পকেটে রেখে বলি—পুলিসে খবর দিন, আমার আর কিছু করবার নেই।

আর একদিনের কথা না বললে কথা শেষ হয় না।

চেম্বারে ভিড় নেই, বসে একখানা সাইকোলজির বই পড়ছিলাম।

আমার চেম্বারের কাছেই থাকেন এক ভদ্রমহিলা। সাত-আট বছরের মেয়েকে কোলে করে নিয়ে এসে শুইয়ে দিলেন আমার টেবিলের ওপর। হাউ হাউ করে কেঁদে বললেন—ডাক্তারবাবু, দেখুন, কি সর্বনাশ হয়েছে!

রুগী দেখেই আমি বুঝতে পেরেছি তার অবস্থার কথা। তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করি—কি করে হ'ল?

ভদ্রমহিলা বলেন—সন্ধ্যের সময় কিছুতেই পড়াতে বসাতে পারি না। কেবল খেলা করছিল মেয়েটা। রেগে গিয়ে দু-একটা

চড় মেরেছিলাম। সেই যে ককিয়ে নেতিয়ে পড়লো মেয়েটা, আর সাড়া দিচ্ছে না। আপনার যেতে পাছে দেরি হয় তাই কোলে করে নিয়ে চলে এসেছি।

তাড়াতাড়ি মেয়েটির পাল্‌স্‌ দেখতে গেলাম। কিন্তু পাল্‌স্‌ দেখব কার? প্রায় দশ-পনেরো মিনিট আগে মেয়েটি মারা গেছে।

ভদ্রমহিলা বলেন—এতো ডাকছি তবুও সাড়া দিচ্ছে না।

আমি বলি—সাড়া ও আর কোনও দিনই দেবে না। কারণ আপনার এই অধৈর্যের ফলই আপনার সন্তানের মৃত্যুর কারণ হয়েছে। হা-হুতাশ করে কি আর হবে, কারণ যা হবার তা হয়ে গেছে।

অধৈর্যের ফল যে কতদূর সাংঘাতিক হতে পারে, তা পরিষ্কার আপনারা বুঝতে পারছেন।

রবার্ট ব্রুস আর মিলটনের ধৈর্যের কথা বলে আপনাদের বিরক্তি উৎপাদন করব না; তবে এইটুকু কেবল আমি বলব আপনি যদি ধৈর্য না ধরেন তা হলে ক্ষতি হবে আপনারই সবচেয়ে বেশী, যে ক্ষতির পরিমাণ আজ আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। শুধু তাই নয়, আপনার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা বা স্বামীকে যদি একটুকু ভালবাসেন, তাদের কল্যাণের জন্য আপনাকে ধৈর্য ধরতেই হবে।

যুদ্ধোত্তর ভারতে সারা ভারতবর্ষব্যাপী দেখেছি কেমন যেন অধৈর্যের ভাব। কেবল ভারত কেন, সারা পৃথিবীতেও আজ এই হাওয়া উঠেছে। জীবনযাত্রার মান অকারণেই উন্নত হচ্ছে,

আর মানুষের ধৈর্যচ্যুতিও ঘটছে। ফলে মানসিক রোগ দেখা দিচ্ছে।

আগে রাঁচীতে মানসিক হাসপাতালে রুগী হত না, আজকাল যা হাসপাতাল আছে তাতেও স্থান হচ্ছে না। অবশ্য এর দ্বারা আমি এই বলছি না যে, কেবল অধৈর্যের ফলে এই রোগ হচ্ছে। তবে অনেক "কেস" বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখেছি যে ঐ ছোট্ট একটি কথায় কি ভয়ংকর ব্যাপারই না ঘটে।

এর পরেও আপনারা কি আমায় বলবেন—নিছক সাহিত্য করবার জন্যেই আমি ভাওয়ালের কবির ঐ কথাগুলি বলেছি? তার কি কোন প্রয়োজন আপনাদের জীবনে নেই?

দুশ্চিন্তা

মানসিক ডাক্তার হিসেবে নিত্য কত লোকই না আমার কাছে আসে! কত রোগীকেই না আমাকে পরীক্ষা করতে হয়! তাঁদের মধ্যে কেউ বা বলেন, তাঁর শরীরে বড় ব্যথা, ভালভাবে সোজা হয়ে দাঁড়াতেও পারেন না। আবার কেউ বা বলেন, যা খান তা একেবারেই হজম হয় না। লিভারটা বুঝি তাঁর একেবারেই পচে গেছে! সারবার আশা বুঝি আর নেই!

কেউ বা এসে বলেন, দারুণ মাথার যন্ত্রণা। মনে কোনও কথাই রাখতে পারেন না। সব কেমন যেন গোলমাল হয়ে যায়।

পরীক্ষা করে দেখা যায় এ ধরনের রোগীর রক্তচাপও অনেক সময় বেশী হয়।

কিন্তু ডাক্তার হিসেবে আমি জানি বাইরের প্রকাশ বিভিন্ন হলেও আসলে এঁদের প্রত্যেকের রোগ সেই একই কারণ থেকে সৃষ্টি হয়েছে। সে কারণটা আর কিছুই নয়, সেটা হল—দুশ্চিন্তা।

এই দুশ্চিন্তা মানুষের জীবনে কত রকমে যে দেখা দেয় আজ সেই কথাই বলব।

একজন ব্যবসায়ী আমার কাছে এলেন। সম্প্রতি তাঁর মিলে ধর্মঘট হয়েছিল।

শ্রমিকদের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারেননি বলে, সম্প্রতি কাজ থেকে অবসর নয়েছেন। তাঁর জায়গায় মিলের সমস্ত ভার নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন তাঁরই উপযুক্ত পুত্র।

কাজকর্ম ভালই চলছে কিন্তু তবুও তাঁর দুশ্চিন্তার শেষ নেই। কেবলই ভয়, বয়স কম বলে যদি তাঁর ছেলেকে কেউ ঠকিয়ে দেয়!

আমি বলি—আপনি ভাবছেন কেন?

ভদ্রলোক বলেন—ভাবছি এই জন্যে যে ছেলেটা মানুষ হল না বলে!

তাঁকে প্রশ্ন করি—কি বলতে চান আপনি?

ভদ্রলোক বলেন—বলতে আমি কিছুই চাই না। অমন ঠাণ্ডা মেজাজের ছেলে, ও কি কাজ ঠিক করতে পারবে?

কেমন কৌতূহল হল। এদিকে ভদ্রলোকের সিটিং দিই আর ছেলের সম্বন্ধে অনুসন্ধান করি। পরে জানতে পারলাম ছেলেটি সত্যই শান্ত প্রকৃতির। কর্মচারীদের সঙ্গে ব্যবহার করেন নিজের ভায়ের মতন। ফলে কর্মচারীরা উৎসাহিত হয়ে কাজে মন দিচ্ছেন। শুধু তাই নয়, বৃদ্ধ ভদ্রলোকের সময় কোম্পানির মাল যা তৈরী হত আজকাল হচ্ছে তার দ্বিগুণ। বৃদ্ধকে সে কথা বলে বলি, কেন মিছে ভাবছেন আপনি?

উত্তরে তিনি বলেন—আপনি দেখে নেবেন ডাক্তারবাবু, একদিন সব কিছু নষ্ট হয়ে যাবে। আর তার ফলে বুড়ো বয়সে আমাকে দাঁড়াতে হবে রাস্তায়।

আমি প্রশ্ন করি—কেন বলছেন এ কথা?

ভদ্রলোক একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেন—আর, ডাক্তারবাবু, দুঃখের কথা কি আর বলব! আমার কর্মচারীরা কি মানুষ, তারা সব ডাকাত। ছুরি শানিয়ে রেখেছে, ফাঁক পেলেই গলায় বসিয়ে দেবে। তখন তো আর কোন উপায়ই থাকবে না বাঁচবার!

এতক্ষণ পর ভদ্রলোকের দুশ্চিন্তার কারণ বুঝতে পারলাম।

দীর্ঘদিন ধরে তিনি যাদের সঙ্গে ওঠা-বসা করেছেন, কাজ করেছেন, তাদের আদৌ বিশ্বাস করেন না তিনি। সব সময়ে তাদের ভেবেছেন শত্রু। তাই যে চিন্তা তাঁর অবচেতন মনের মধ্যে ছিল তা আজ এসেছে সচেতন মনের মধ্যে। ফলে ভদ্রলোক দুর্ভাবনায় আজ অবসাদ-রোগগ্রস্ত।

একটানা এই রকম চিন্তা করার ফলে, আজ কোন জিনিসকেই তিনি ভাল চোখে দেখতে পারছেন না। এমন কি তাঁর ছেলের সুব্যবহারে কর্মচারীরা উৎসাহিত হয়ে কোম্পানির উৎপাদন-ক্ষমতা যে বাড়িয়ে দিয়েছেন তা তাঁর বোঝবার ক্ষমতা নেই। এর চেয়ে দুঃখের আর কি আছে?

আর একবার একজন ভদ্রমহিলা এলেন আমার কাছে চিকিৎসিত হতে। বয়স বছর চল্লিশের মধ্যে। বড় মেয়ের বিয়ে দেবার পর থেকে ভদ্রমহিলা কেমন যেন ক্ষেপে উঠেছেন। অকথ্য ভাষায় স্বামীকে সকলকার সামনেই গালাগালি করছেন—এবং সব সময় মনে ভাবছেন তাঁর স্বামী বুঝি অন্য স্ত্রীলোকের সঙ্গে প্রেম করেন!

বেশ কিছুদিন 'সিটিং' দেবার পর বুঝতে পারলাম ভদ্রমহিলাকে ছেলেবয়সে বিয়ের সময় অনেকবার করে দেখানো হয়েছিল। গায়ের রং ময়লা বলে, ছেলের অভিভাবকেরা তাঁকে পছন্দ করেননি। এইভাবে বহু জায়গায় প্রত্যাখ্যাতা হয়েছেন তিনি। ফলে তিনি সুন্দরী নন, কুৎসিত, কোন যুবক বা তাঁর অভিভাবকেরা তাঁকে পছন্দ করতে পারেন না,—এই ধারণাই তাঁর মনে বদ্ধমূল হয়ে ওঠে।

এই চিন্তা তাঁর অবচেতন মনে দৃঢ়ভাবে গেঁথে যায়। তার

কারণ, সেই সময়ে ভদ্রমহিলার দুশ্চিন্তা হয়, বাবা মা যতদিন আছেন ততদিনই আদর আছে, তার পর কি হবে তাঁর ?

পরে সময়মত ভদ্রমহিলার বিয়ে হল। কিন্তু অবচেতন মন থেকে সেই দুশ্চিন্তা মুছলো না।

আজ প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হয়ে নিজের কন্যার বিবাহ দিয়ে সেই চিন্তাই সচেতন মনে দেখা দিল। কিন্তু সে রূপে নয়, স্বামীর ওপর 'সন্দেহ' আকারে।

পাঠক-পাঠিকার কাছে অনুরোধ, এইটুকু লেখা পড়েই লেখককে কোন মানসিক হাসপাতালের রোগীশ্রেণীভুক্ত করবেন না। কারণ মনের বিভিন্ন ধরনের খেলা আমাকে দিনরাত দেখতে হয় বলেই আজ এ কথা আমি বলতে সাহস পেয়েছি।

শুধু তাই নয়, আপনারা বিস্মিত হয়ে যাবেন যদি আমি বলি, আমাদের নিজেদের মনের খবর আমরা নিজেরাই ভাল করে জানি না। আপনারা বলবেন—তাও আবার হয় নাকি ?

আমি বলবো—তাও হয়। যেটুকু মন দিয়ে আমরা চিন্তা করি, সবকিছু অনুভব করি, তা বিশাল মনের কতটুকু অংশ মাত্র। মাত্র এক আনা অংশ আমাদের থাকে সচেতনের মধ্যে। বাকি পনেরো আনা অংশ থাকে আমাদের অবচেতনের মধ্যে। তার খবর আমরা পাব কি করে ?

একজন বিখ্যাত সমীক্ষক কথাটা ভাল করে বোঝাতে গিয়ে বলেছেন, একটা বিরাট গামলার মধ্যে জল পূর্ণ করা আছে। তার মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হল খানিকটা বরফ। বরফের অত্যন্ত সামান্য অংশই জলের ওপরে ভেসে রইলো। ঐ ভেসে-থাকা বরফের অংশটুকুই আমাদের সচেতন মন। আর মনের ঐ অংশটুকুই আমরা বুঝতে পারি। আর বাকি সবটুকুই থাকে আমাদের কাছে

অজানা। সেইটাই অবচেতন মন। আর সেই অজানা দেশের কোন দুশ্চিন্তা কখন ছুঁচের আকারে প্রবেশ করে তিল তিল আকারে নিজেকে বর্ধিত করে, কখন সে কোন্ রূপে আমাদের সচেতন মনে দেখা দেবে, তা আমাদের কাছে থাকে অজানা।

এত কথা বলতাম না, যদি না আমারই এক রুগী মাত্র তিরিশ বছর বয়সে অবসাদ সহ্য করতে না পেরে নিজের জীবনকে নষ্ট করতো।

ছেলেটি আমার কাছে এসেছিল মাস ছয়েক আগে। বেশ সুন্দর, সুঠাম, বলিষ্ঠ দেহ, কিন্তু অবসাদে যেন ভেঙ্গে পড়েছে! প্রথমটায় মনে করেছিলাম বোধ হয় কোন প্রেম-ঘটিত ব্যাপার হবে। কিন্তু পরে বুঝলাম আমার অনুমান একেবারে মিথ্যা।

ছেলেবয়সেই "জর্জ দি থার্ড"-এর মায়ের মতন, একরকম প্রত্যহ, ছেলেটির মা ছেলেটির কানে বলতেন—"খোকা, ভাল করে লেখাপড়া শেখ। লেখাপড়া শিখতে পারলে তবে তুই টাকা রোজগার করতে পারবি। আর সেই টাকা দিয়ে বাড়ি গাড়ি, এককথায় পৃথিবীতে যা কিছু উপভোগের জিনিস আছে, সব কিছু উপভোগ করতে পারবি।"

ছেলেটি উৎসাহিত হয়ে টাকা রোজগারের আশায় পড়াশুনা করতো। সেই ছেলেটিরই একটি আত্মীয় উকিল ছিলেন। ভগবানের দয়ায় তিনি প্রচুর রোজগারও করতেন। তাই ছেলেটিও উকিল হওয়া সাব্যস্ত করলো ভবিষ্যতে। তার মেধা তত তীক্ষ্ণ ছিল না, প্রাণপণ শক্তিতে খেটে তাকে আইন পাস করতে হল।

বাড়ির অবস্থা ভাল না বলে শেষের দিকে ছেলে পড়িয়ে টাকা রোজগার করে ছেলেটি তার লেখাপড়া শেষ করেছিল।

মনে আশা ছিল, আইন পাস করার সঙ্গে সঙ্গেই সে রাতারাতি স্যার রাসবিহারী কিংবা স্যার আশুতোষ হতে পারবে।

কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা! আইনব্যবসা ভালভাবে করতে গেলেও যে সময়ের প্রয়োজন তা তার কোথায়?

কোর্টেতে যাওয়া-আসাই সার হল। ওদিকে বাপ-মা'র বয়স হয়েছে বলে সংসারের অনেকখানি চাপই এসে পড়েছে তার কাঁধে তখন।

ছেলেটি কিছুই করতে পারে না। অভাবের তাড়নায় মা'র স্নেহময়ী মূর্তি পরিবর্তিত হয়ে গিয়ে সেখানে দেখা দিয়েছে একটা বিশ্রী কঠোরতা। তাঁর বিশ্বাস, ছেলে চেষ্টা করে না বলেই রোজগার করতে পারে না। কারণ বাইরের জগতের সঙ্গে তাঁর পরিচয় কতটুকু? আগে ছেলেটি লেখাপড়া আর ভবিষ্যতের আশায় ভুলে থাকতো, ইদানীং তাও আর নেই। মন সদাসর্বদা তাকে পীড়া দিতে শুরু করলো। জীবনের ক্ষেত্রে আশার অনুরূপ ফল না পেয়ে ছেলেটি পড়লো একেবারে ভেঙ্গে।

যে মায়ের কথায় সে নিজেকে গড়ে তুলেছিল, সেই মায়ের কথা তার জীবনে মিথ্যা প্রমাণিত হল। আর স্নেহময়ী জননীকে সে দেখেছিল ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হতে। তাই তার জীবনে নেমে এলো হতাশা।

আমার সিটিং-এর সময় তাকে 'আশা'র কথা বলায় কোনও ফলই হল না তার জীবনে।

নিজের জীবনকে শেষ করে সব কিছু জ্বালাযন্ত্রণার হাত থেকে সে অব্যাহতি পেল। আর সংসারটাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে গেল একটা স্রোতের ভাঙ্গনের মুখে।

উপরোক্ত কয়েকটা দৃষ্টান্ত থেকে আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারছি, দুশ্চিন্তা আর দুর্ভাবনা মানুষের জীবনে কতরকম উপায়ে প্রবেশ করতে পারে। তাই আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ, অকারণে নিজের মুখ গোমড়া করে নিজেকে "ভারীক্কে" করবার চেষ্টা করবেন না। সদাসর্বদা মনে রাখবেন দ্বিজেন্দ্রলালের সেই কথা—

"হেসে নাও দুদিন বৈ তো নয়।"

ভগবানে বিশ্বাস রেখে, মানুষকে কেবল মানুষ মনে করেই জীবন চালিয়ে যাবেন। যদি না চালান তাহলে বহু রকম complex মনের মধ্যে দেখা দিতে পারে।

ধরুন, হঠাৎ একদিন মনে হল, আমার ওপরওয়ালা আমার চেয়ে কিসে বড়? বিদ্যায় না বুদ্ধিতে?

যদি তিনি বড় না হন, তবে তিনি কেন ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন? আমি কেন ঐ পদ পাব না? এই চিন্তা যদি আপনার মনের মধ্যে ওঠে, তখুনি তাকে ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করবেন; যদি না করেন, তাহলে লোকের কাছে আপনাকে বলতে হবে ব্যাকিং পেলেই— আপনিও—।

আমি স্বীকার করি যোগ্যতায় আপনি কোন অংশে কম নন। কিন্তু পরিবেশকে অস্বীকার করবেন কি করে? আর শুধু তাই নয়, এই জিনিসটা মনের মধ্যে বর্ধিত হলে তখন দেখা দেবে হিংসা। রাগ হবে নিজের ওপর। ফলে, হয় আপনার আসবে উত্তেজনা, নয় আসবে অবসাদ।

এর হাত থেকে পরিত্রাণের একটি মাত্র উপায় আছে, তা অপরকে ভালবাসা।

তাই বলছি যে অবস্থায় আছেন, সব সময় সেই অবস্থায় নিজেকে সুখী মনে করবেন।

যদি কোন কারণে কারুর ওপর রাগ হয় তবে সেই সময়ে তার সব গুণগুলির কথা চিন্তা করবেন।

মনে রাখবেন—সকলকে বন্ধু ভাবলে, আপনার মনের মধ্যে দুশ্চিন্তা আসা শক্ত। আর তা না এলেই আপনার চেয়ে সুখী এ পৃথিবীতে আর কেউ থাকবে না।

আরও দুশ্চিন্তা

বহু পাঠক আমাকে চিঠি দিয়েছেন, এই দুশ্চিন্তার বিষয় যেন আমি তাঁদের আরও ভাল করে জানাই। আরও নতুন দিক থেকে যেন জিনিসটিকে বিচার করি।

এইখানে বলে রাখা ভাল, কোন লোকের মন আর একজন লোকের সঙ্গে মেলে না। তাই একজন লোকের চিন্তার সঙ্গে আর একজনের চিন্তা এবং তার প্রকাশ মিলবে না। তাই সকলকার দুশ্চিন্তার ধারা একরকম নয়।

ধরা যাক, আজ রামবাবু বারোটার ট্রেনে কলকাতা থেকে যাবেন বিদেশে বেড়াতে। দেখা গেল, কাল রাত্রে তিনি ভাল করে ঘুমুতে পারেননি। সদাসর্বদা মনে ছিল আতঙ্ক, যদি ঘুমিয়ে পড়লে কোনভাবে ট্রেন ফেল করেন! তাই তিনি পরিবারের সকলকে নিয়ে সকাল দশটার মধ্যেই হাওড়া স্টেশনে হাজির হয়েছেন।

শুধু এই নয়, ঘন ঘন কেবলই প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করছেন কখন ট্রেন আসবে বলে।

রামবাবুর তাড়ার চোটে আসবার সময় গৃহিণী পানের ডিবেটা ফেলে এসেছেন বাড়িতে। পান আর সময়মত দোক্তা না পেয়ে তাঁর মেজাজও সপ্তমে চড়ে রয়েছে। প্ল্যাটফর্মেও বেশ একটা বচসা স্বামীর সঙ্গে তাঁর হয়ে গেল।

ছোট খুকীটার ক্ষিদে পেয়েছে, সেও কান্না জুড়েছে। কিন্তু সব দেখে শুনেও রামবাবুর মুখে সেই এক কথা—আরে গাড়িতে যদি না জায়গা পাও তখন কি হবে?

এখন ধরা যাক, রামবাবু নিজের তাড়ায় পরিবারস্থ সকলের অসুবিধার সৃষ্টি করলেন কেন? উত্তরে আমি একটি কথা বলব। সেটা আর কিছুই নয়—ট্রেন-ফেল-করার দুশ্চিন্তা।

শুধু এই ব্যাপার নয়, আমার এক বন্ধুর, ট্রেনে কোথাও যেতে হলে বা ঐ ধরনের কোন মানসিক উত্তেজনার কারণ ঘটলে, "বিশেষ কোন স্থানে" যাবার দরকার হত। অথচ তিনি রামবাবুর মতন দু'ঘণ্টা আগে স্টেশনে এসে বসে থাকতেন না। তবে তাঁর এমন হত কেন?

আমি বলব এরও উত্তর সেই একই। আপনারা হেসে বলবেন—আরে দূর, এও আবার কখনও হয়! দুশ্চিন্তা হল মনের ব্যাপার। এমন শারীরিক প্রকাশ হবে কেন তার!

এর উত্তরে আমি আমার একটি রুগীর কথা বলব।

নিজের চেম্বারে বসে আছি। একটি সাতাশ আটাশ বছরের ছেলে এসে আমার সঙ্গে দেখা করে। ছেলেটি বলে তার শরীর অত্যন্ত খারাপ যাচ্ছে। বুকের কাছে একটা যন্ত্রণাও হয়।

পরীক্ষা করতে শুরু করলাম। দেখলাম শরীরে রক্তচাপ অনেক বেশী। হার্টের অবস্থাও বেশ দুর্বল।

রুগীটিকে পরীক্ষা করে ওষুধ দিলাম। তিন দিন পরে এসে আবার দেখা করতে বললাম। কিন্তু "কাকস্য পরিবেদনা"। ঔষধে উপকার ছেলেটির একেবারেই হয়নি।

কেন এমন হল? রুগীকে প্রশ্ন করি—ওষুধ ঠিক খেয়েছিলে তো?

ছেলেটি বলে—আমি সত্যি করে বলছি ডাক্তারবাবু, আপনার নিয়ম আমি অক্ষরে অক্ষরে মেনেছি।

ওষুধে কোন কাজ হচ্ছে না দেখে আমিও কেমন যেন হতাশ হয়ে পড়ছিলাম।

আমাদের ডাক্তারী শাস্ত্র অনুপাতে তার সমস্ত কার্যকলাপের ইতিহাস নিচ্ছিলাম। দেখলাম ছেলেটি বিশেষ কিছুই করে না। তবে এমন হবে কেন ?

হঠাৎ ছেলেটিই তার সমাধান করে দিয়ে বলে, ডাক্তারবাবু, সারতে আমি পারব না। আমাকে আপনি মরতেই দিন।

—কেন মরবে তুমি ?—উৎসাহিত হয়ে আমি প্রশ্ন করি।

—কি হবে বেঁচে থেকে !—ছেলেটি বলে।—দিনরাত যদি ঐ স্ত্রীর সঙ্গে থাকতে হয়, তা হলে বেঁচে থেকে কি লাভ !—একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ছেলেটি বলে।

আমিও বুঝতে পারি তার আসল রোগ কোথায়। ওষুধপত্র কমিয়ে দিয়ে ছেলেটির মনঃসমীক্ষণের 'সিটিং' দিতে আরম্ভ করি। তাতে জানতে পারি, ছেলেটির স্ত্রী দিনরাত স্বামীর সঙ্গে কেবল ঝগড়ায় প্রবৃত্ত হয়। শুধু তাই নয়, অকথা-কুকথা বলে স্বামীকে অপমানও করে। আর নিত্য নতুনভাবে অপমানিত হয়ে ছেলেটির মনে দেখা দিয়েছে দারুণ দুশ্চিন্তা। তাই হতাশ হয়ে ছেলেটি মনে মনে মৃত্যুই আকাঙ্ক্ষা করছে, যেমন করেই হোক অমন মুখরা স্ত্রীর হাত থেকে তাকে উদ্ধার পেতেই হবে। তাই তার দেহে আজ দেখা দিয়েছে নানারকম ব্যাধি। আর মেয়েটি বুঝতেও পারছে না ধীরে ধীরে সে তার সংসারের সবচেয়ে প্রিয়জনকে ঠেলে দিচ্ছে মৃত্যুর দিকে।

এর চেয়ে দুঃখের আর কি হতে পারে ?

আর একবার একটি ছেলে এলো। সমস্ত গায়ে দেখা দিয়েছে

চুলকুনির মত একরকম রোগ, ডাক্তারী শাস্ত্রে যাকে allergy বলে। Allergy নিয়ম অনুপাতে তার খাওয়া-দাওয়ার বিশেষ ব্যবস্থাপত্র দিলাম। আজ এটা খেও না, কাল ওটা খেও না বলে দীর্ঘদিনও গেল। কিন্তু ছেলেটির উপকার হল না কিছুই। অনেকদিন মেলামেশার ফলে ছেলেটি তার সংসারের নানাধরনের গল্পও করতো আমার কাছে।

এই গল্পের সূত্র ধরেই আমি একটা ব্যাপার সন্দেহ করে ছেলেটিকে 'সিটিং' দিতে লাগলাম।

তাতে পরিষ্কার জানতে পারলাম ছেলেটি তার স্ত্রীকে ভালবাসে অত্যন্ত। শুধু ভালবাসা নয়, স্ত্রীর সঙ্গে একাত্মবোধ তার হয়ে গিয়েছিল। স্ত্রীর সুখে সে সুখ পেত, স্ত্রী দুঃখ পেলে সে দুঃখ পেত।

আপনারা বলবেন—এতখানি দাম্পত্য প্রেম যেখানে সেখানে তো সুখ থাকবারই কথা।

আমি বলব—তাই থাকবার কথা বটে, কিন্তু এক্ষেত্রে তা ছিল না। কারণ স্ত্রীর ছিল দারুণ উচ্চাভিলাষ। নিজের অবস্থায় মেয়েটি সুখী হয়নি। নিত্য নতুন তার চাহিদারও শেষ ছিল না। আর এই চাহিদা মিটিয়ে স্ত্রীকে সুখী করতে পারতো না বলেই ছেলেটির মনে দেখা দিয়েছিল দুশ্চিন্তা আর তারই ফলে ধীরে ধীরে মনেপ্রাণে সেও পড়ছিল ভেঙে, ফলে গায়ে দেখা দিয়েছিল allergy।

তাই বলে আমি এই মানে করছি না যে সব সময় allergy হয় মানসিক দুশ্চিন্তা থেকে।

এক্ষেত্রে ছেলেটির মনের ঐ রকম বিকার থেকে ঐ রোগ দেখা দিয়েছিল।

শুধু এই নয়, মন থেকে মানুষের যে কত শারীরিক ব্যাধি দেখা দিতে পারে তা বলে শেষ করা যায় না। বাত, আর্থ্রাইটিস, আল্সার,—এও হতে দেখেছি। এমন কি শুনেছি দুশ্চিন্তা থেকে দাঁতেও নানারকম রোগ দেখা দেয়।

এমনও দেখেছি রুগীর পেটের মধ্যের 'আল্সারের' মুখে ছাল পড়ে আসছে, আমরা সকলে আশা করছি রুগীটি এবার সুস্থ হয়ে যাবে, এমন সময় তার দেখা দিল দুশ্চিন্তা। তার ফলে 'আল্-সারের' মুখ গেল ছিঁড়ে। ঘন ঘন রক্ত-পায়খানা আর বমির ফলে লোকটির হল মৃত্যু।

তাহলে উপরোক্ত দৃষ্টান্ত থেকে আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারছি, মানসিক বিকার থেকে শারীরিক ব্যাধিও দেখা দিতে পারে।

শুধু এই নয়, নানা ধরনের মানসিক বিকারও তার সঙ্গে সঙ্গে দেখা দেয়।

একবার একটি ষোল সতের বছরের ছেলে এলো আমার কাছে চিকিৎসিত হতে। দিব্বি স্বাস্থ্য। শরীরে কোথাও দুর্বলতার চিহ্ন নেই। ছেলেটির বাবা আমাকে বললেন—দেখুন ডাক্তারবাবু, ওকে আপনার কাছে নিয়ে এলাম, ওর সব ভাল, দোষের মধ্যে কারুর সঙ্গে কথা বলে না। অথচ আমি নিজে ব্যারিস্টার, থাকতে থাকতে ছেলেটাকে যদি আমার আইন-ব্যবসায়ে বসিয়ে দিয়ে যেতে পারি তাহলে ভবিষ্যতে আর আমার কোন ভাবনা থাকবে না। কিন্তু ভাল বক্তা না হতে পারলে তো এ ব্যবসায়ে সে সুবিধা করতে পারবে না!

আমি তো তাজ্জব! ছেলেটি কথা বলে না কেন?

কথা তাকে বলতে বলি। সে মুখের দিকে চেয়ে কেবলই মৃদু মৃদু হাসে।

অনেক কষ্টে তার নাম বলালাম। ধীরে ধীরে সে কথাও বলতে শুরু করলো। কিন্তু তার কথা না বলবার কারণ বুঝতে পারলাম না।

একদিন তাকে প্রশ্ন করি—আচ্ছা, তোমার কথা বলতে গেলে কি হয়?

সে বলে—দেখুন, যেই আমি কথা বলতে যাই, অমনি যেন আমার সব কথাই শেষ হয়ে যায়।

একটু সূত্র পেলাম। তারপর অনেক অনুসন্ধানের ফলে জানতে পারি, ছেলেবয়সে ছেলেটিকে তার মা কথা বলার জন্যে ভীষণ মারধোর করতেন। শুধু মারধোর নয়, সময় সময় ঘরে পুরেও রাখতেন।

নির্জন ঘরে বন্দী হওয়ায় ছেলেটির মনে বড় দুশ্চিন্তা আসে—এই বুঝি আমি কথা বলে ফেললেই শাস্তি পাব।

বাড়িতে সে কথা বলা বন্ধ করলো। ক্রমে তাও বন্ধ হয়ে গেল স্কুলে। আজ কলেজের ছাত্র হয়েও, তার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সে কোন কথা আর বলতে পারে না।

আর একবার এক ভদ্রমহিলা এলেন আমার কাছে। তাঁর রোগ—সদাসর্বদা তাঁর পেট ফুলছে। অথচ পরীক্ষা করে শারীরিক কোন ব্যাধি আবিষ্কার করতে পারলাম না।

শুরু করলাম ভদ্রমহিলার 'সিটিং' দেবার। এই 'সিটিং' দিতে গিয়েই জানতে পারি, ভদ্রমহিলার স্বামী একসময় বিশেষ

অর্থকষ্টে পড়েছিলেন। প্রাণপণ পরিশ্রমের পর তিনি সেই অর্থকষ্ট থেকে উদ্ধার পান।

আজ তাই বাজারের সমস্ত জিনিসপত্রের দাম বাড়তে দেখে তাঁর মনে আবার সেই দুশ্চিন্তারই আবির্ভাব হয়েছে। ফলে তাঁর হজমের হয়েছে গোলমাল। আর তার থেকে সৃষ্টি হয়েছে মানসিক বিকার।

শুধু এই নয়, আরও একটা কাহিনী বলি। আর একজন ভদ্রমহিলার স্বামী এসে আমাকে বললেন—মেয়ের বিয়ে দেবার পর থেকে তাঁর স্ত্রী হঠাৎ মেয়ের সঙ্গে দুর্ব্যবহার আরম্ভ করেছেন। বাপের বাড়িতে মেয়ে এলে চোখের জল না ফেলে তার দিন যায় না। এমন ঘটনার কারণ কি কিছুই বুঝতে পারি না। ভদ্রমহিলার 'সিটিং' দিতে দিতে জানতে পারি খুব ছেলেবয়সে তাঁর বিয়ে হয়। বিয়ের পর শাশুড়ী কিন্তু নববধূকে ভাল চোখে দেখেননি। ফলে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা তো ছিলই, সময় সময় তা চরমেও পৌঁছুতো।

দিন কারুর জন্যে অপেক্ষা করে না। এ ক্ষেত্রেও করলো না। হ্যাঁ, আর একটা কথাও বলতে ভুলে গেছি। মহিলাটির স্বামীর অবস্থাও তখন ভাল ছিল না। তাই ইচ্ছামত তিনি কিছু কেনাকাটাও করতে পারতেন না।

ক্রমে সময় হল। শাশুড়ীর মৃত্যু হল। কিন্তু তাঁর অবচেতন মন থেকে সেই দুঃখের দিনের স্মৃতি মুছলো না।

মেয়ের বিয়ে হল বড়লোক ছেলের সঙ্গে। মেয়ে ইচ্ছেমত টাকা খরচা করতে পারে বলে তাঁর যত ঈর্ষা মেয়ের ওপর। আর অতীত দিনের স্মৃতি মেয়ের ওপর এইরূপে দেখা দিয়েছে।

আর একবার একটি বাচ্চা ছেলে এলো আমার কাছে। বয়স—তা দশ থেকে বারোর মধ্যে হবে। এই বয়সেই ছেলেটি প্রচণ্ড উত্তেজিত আর ভীষণ রাগী। যৌন সম্বন্ধেও দেখলাম ছেলেটির বেশ জ্ঞান এসে গেছে। কিন্তু এমন হবার কারণ কি ?

পরে জানতে পেরেছিলাম সব শিশুদের মত সেও জন্মের পর আঁকড়ে ধরেছিল তার মা'কে। কিন্তু শিশু অবোধ, কিছু বোঝে না,—এই ধারণায় তার বাবা মা ছেলের সামনে নানা হাস্য-পরিহাস করতেন, এমন কি আলিঙ্গন, চুম্বনও ইত্যাদি করতেন। মা'কে বাবার কণ্ঠলগ্ন দেখে ছেলেটির মনে ধারণা জন্মায় পৃথিবীতে বুঝি তাকে ভালবাসতে আর কেউ নেই।

এর ফলে ধীরে ধীরে ছেলেটি হল উত্তেজিত। আর দুশ্চিন্তার ফলে হল মানসিক বিকারগ্রস্ত।

আপনারা হয়তো বলবেন, এসব ব্যাপার তো প্রায় সব সংসারেই ঘটে থাকে। তাহলে আমরা সুস্থ মানুষ বুঝবো কি করে ?

সে ক্ষেত্রে আমি বলব যিনি সর্ব অবস্থায় নিজের বৈশিষ্ট্য বাঁচিয়ে রেখে মানিয়ে চলতে পারেন তিনিই প্রকৃত সুস্থ মানুষ।

সুখ আর দুঃখ যা আমরা বাইরে খুঁজে বেড়াই তা বাইরে নেই, রয়েছে আমাদেরই মনের মধ্যে। অথচ এমনই মূর্খ আমরা, তারই জন্য আমরা মানুষকে করি দায়ী এবং আমাদের অভি-যোগেরও আর শেষ থাকে না!

অনেকবার অনেককে বলতে শুনেছি, অমুক যদি আমার স্বামী বা স্ত্রী না হয়ে অমুক যদি হত তা হলে আমি……

কিন্তু তিনি ভুল করেন। যে কারণে অমুক তাঁর কাছে বিষ

হয়ে গেছেন সেই কারণেই বা অন্য কোন তুচ্ছ কারণে অমুকও তাঁর কাছে বিষ হয়ে উঠতে পারতো। এ কথা তাঁর মনে রাখা উচিত।

এখন প্রশ্ন হল, এই দুশ্চিন্তা আর দুর্ভাবনার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায় কি উপায়ে?

একজন বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ্ বলেছেন, "কখনও অতীতের কথা চিন্তা করো না। ভবিষ্যতের দুর্ভাবনায় কখনও ভেঙে পড়ো না। বর্তমানে কিভাবে আনন্দে থাকতে পার তারই চেষ্টা কর। প্রতিদিনের সূর্যকে নতুন মনে, নতুন উৎসাহে আবাহন কর। দেখবে দুশ্চিন্তার হাত থেকে তুমি রক্ষা পাবে।"

এর জাজ্বল্য প্রমাণ দেখেছিলাম আমি এক সন্ন্যাসীর মধ্যে। ডাক্তার হিসাবে তাঁর চিকিৎসার ভার আমারই ওপর পড়েছিল।

কোন কারণে তাঁর পা দুটো আমাদের কেটে ফেলতে হয়। কিন্তু তাতেও আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল না। ধীরে ধীরে আমাদেরই চোখের ওপর তিনি মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন। সত্তর বছরের বৃদ্ধ, দীর্ঘদিন বিছানায় শোবার ফলে 'বেডসোর'ও হয়েছে তাঁর, অথচ মুখে ফুটে ওঠেনি এতটুকু যন্ত্রণার রেখা। সদাসর্বদা যেন তিনি হাসছেন।

আমাদের মধ্যে একজন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন—স্বামীজী, আপনার যন্ত্রণা হচ্ছে না?

হেসে তিনি জবাব দিয়েছিলেন—এ শরীর তো একদিন যাবেই। তবে মিথ্যে তাতে আর মন দিয়ে নিজের কষ্ট বাড়াই কেন? ওর যা হবার হোক। আমি আমার কাজ করে যাব।

ঠিক মৃত্যু যখন তাঁকে আশ্রয় করছে সেই সময় তিনি ঘরে উপস্থিত লোকজনকে ইশারায় বললেন তাঁকে বসিয়ে দিতে।

গম্ভীর বেদমন্ত্র উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরই চোখের সামনে তাঁকে মৃত্যু আশ্রয় করে। মৃত্যুর পর মুখের দিকে চেয়ে দেখি তাঁর মুখ পূর্ব্ববৎই রয়েছে শান্ত, যেন তিনি হাসছেন।

তাই বলছি সংসারে যা ঘটবার ঘটুক, আমি হেসে খেলে দিন কাটিয়ে যাব—আমার মন তাতে দোব না।

এই প্রতিজ্ঞা করে যদি আপনি পালন করেন, তাহলে দেখবেন আপনিও ছোটখাট বহু দুশ্চিন্তার হাত হতে রেহাই পেয়েছেন।

আর মনে রাখবেন যা ঘটবার তা ঘটবেই। মাথার ওপরে থেকে ভগবান জগৎ নিয়ন্ত্রিত করছেন।

বেফাঁস কথার ফল

কোন্ আদিম যুগ থেকে মানুষ শব্দ করে তার মনের ভাব প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছিল, সে কথা আজ আমাদের জানা নেই।

তবে আমাদের এইটুকুই জানা আছে, সেই শব্দই পরে রূপান্তরিত হয়েছিল ভাষায়। আর সেই ভাষার সাহায্যেই মনের ভাব প্রকাশ করে কত লেখক, কত কবি লিখে গেছেন তাঁদের গ্রন্থ। আবার সেই ভাষার সাহায্যে আমরা দেখেছি হিটলার যুদ্ধের জন্য সারা জার্মান জাতিকে ক্ষেপিয়ে তুলেছিলেন। তাহলে আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারছি, এই ভাষা বা কথার শক্তি অসীম।

একটা সামান্য দৃষ্টান্ত দিলেই বোঝা যাবে।

একজন ভদ্রলোক কোন এক পরিবারে অতিথি হয়ে এলেন। দু'চার মিনিটের মধ্যেই সেই পরিবারের সকলকে তিনি জয় করে নিলেন। ঘণ্টা দুয়েক পরে তিনি যখন চলে গেলেন, তখন বাড়ির কর্তা থেকে ছোট ছেলেটি পর্যন্ত তাঁকে অনুরোধ জানাল আবার আসবার জন্যে।

আবার অপরদিকে আর একজন ভদ্রলোক এলেন সেই পরিবারেরই অতিথি হয়ে। পাঁচ সাত মিনিট পরেই দেখা গেল ঘর থেকে সকলেই একে একে পালিয়ে যাচ্ছে। কেবল বাড়ির কর্তা চক্ষুলজ্জার খাতিরে সেখান থেকে না উঠতে পেরে মনে মনে খালি আকাঙ্ক্ষা করছেন ভদ্রলোক কখন চলে যাবেন।

তাই বলি—এমনটি হয় কেন?

নিশ্চয়ই দ্বিতীয় আগন্তুকের কথার মধ্যে এমন কোন জিনিস ছিল যা কেউ পছন্দ করল না, অথচ প্রথম ব্যক্তির কথার মধ্যে এমন একটা মিষ্ট আকর্ষণীয় বস্তু ছিল, যা পরিবারের সকলকে তাঁর কাছে ধরে রেখেছিল।

এখন দেখা যাক সে বস্তুটি কি! সে বস্তুটি আর কিছু নয়—মিষ্ট কথা।

আপনারা শুনলে বিস্মিত হবেন, কথা আমরা সকলেই বলি বটে কিন্তু সত্যিকার কথা বলতে আমরা অনেকেই জানি না বা জানবার চেষ্টাও করি না। তার ফলে অধিকাংশ সময় আমরা বন্ধু হারাই আর সেই বন্ধুবিয়োগের ব্যথা মনে আনে অবসাদ।

একবার আমার কাছে একজন রুগী এলো। মেয়েটি হয়েছে অবসাদরোগগ্রস্তা। নিয়মিত মনঃসমীক্ষা করছি। তার জীবনে বাঁচতে মোটেই ইচ্ছে নেই।

আমি প্রশ্ন করি—কিসের এত দুঃখ তোমার?

মেয়েটি বললো—দুঃখের কথা আর কী বলব ডাক্তারবাবু, জীবনে ভালবাসা পেলাম না, কারুর সঙ্গে বন্ধুত্বও হল না। কি হবে এই নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করে?

বন্ধুত্ব হল না? কারণ?

আশ্চর্য হয়ে গেলাম। কিছুদিন পরে বুঝতে পারলাম, মেয়েটি চায় সে একাই কথা বলবে, অন্য সকলে থাকবে তার নীরব শ্রোতা হয়ে। কারুকে কোন কথা বলবার সুযোগ সে দেবে না। সেইজন্যে অন্য লোকে তাকে এড়িয়েই চলে। এবং তার ফলেই তার এই নিঃসঙ্গতা। তাকে বলি—তুমি যাদের সঙ্গে

কথা বল তাদেরও তো কিছু বলবার থাকতে পারে! একটু শোন না কেন ধৈর্য ধরে তাদের কথা?

কিন্তু ছেলেবয়েস থেকে অভ্যাস না করার ফলে, প্রথমটা মেয়েটি বুঝতেই পারল না যে অপরের কথা মন দিয়ে শুনতে হয়।

আর একবার গিয়েছিলাম একটি রুগী দেখতে। ছেলেটির বয়স দশ কি বারোর বেশী হবে না। গায়ে, বুকে, পিঠে অসহ্য যন্ত্রণা। ছেলেটিকে প্রশ্ন করি—আর কি হচ্ছে তোমার?

ছেলেটির মা কাছেই দাঁড়িয়েছিলেন। অমনি তিনি আরম্ভ করলেন—ছেলের জন্মের পর কি কি অসুখ করেছে, কতদিন সে ভুগেছিল, কোন্ কোন্ বিখ্যাত ডাক্তারকে দিয়ে তার চিকিৎসা করিয়েছিলেন। এবারে মা'র কথা না শুনে, কেমন করে ঠাণ্ডা লাগিয়েছে ছেলে। কবে প্রথম তার রোগলক্ষণ দেখা গেল ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রায় কুড়ি মিনিট বক্তৃতা করার পর ভদ্রমহিলা থামলেন।

আমি ছেলেটিকে ফের প্রশ্ন করি—কি যন্ত্রণা হচ্ছে তোমার?

এবারে ভদ্রমহিলা বিরক্ত হয়ে বললেন—আপনাকে বললাম তো সব কথা।

আমি বলি—রুগীকে বলতে দিন, তবে তো ঠিক বুঝতে পারব, তার কি কষ্ট।

আরও বিরক্ত হয়ে ভদ্রমহিলা বলেন—হ্যাঁ, ওইটুকু ছেলে সব বলতে পারে?

ভদ্রমহিলা কথা বলে বৃথা আধঘণ্টা সময় আমার নষ্ট করলেন।

এখন হয়তো আপনারা প্রশ্ন করবেন যে, তাহলে কিভাবে কথা বলা উচিত।

এক্ষেত্রে আমি বলবো—আপনি যখনই যেখানে যান, এবং যাঁর সঙ্গেই কথা বলুন না কেন, প্রথমে লক্ষ্য করবেন, অপরপক্ষ কি ধরনের লোক, এবং কি বিষয়ে তিনি কথা বলতে চান। সেই বিষয়ে তখন কথা আরম্ভ করে বলতে শুরু করুন।

আপনি যতখানি সময় কথা বলবেন, ঠিক ততখানি সময় নিয়ম করে তাঁর কথা শুনবেন। তাহলেই দেখবেন, অনেক সময় আপনার আশার অতিরিক্ত ফল পেয়েছেন।

এই স্থানে আমার এক বন্ধুর ছেলের কথা না বলে পারি না।

ছেলেটি প্রথম থেকেই ইনসিওরেন্সের দালালি করত। প্রথমে সামান্যমাত্র পরিচয় নিয়ে সে যাওয়া-আসা শুরু করল। কিন্তু কোন কাজ তার হত না।

দশ বছর পর, একরকম হতাশ হয়ে গিয়েই সে সে-ব্যবসা ছেড়ে দেবার মনস্থ করল।

পিতৃবন্ধু বলে সে আমার সঙ্গে পরামর্শ করতে এসেছিল।

কথায় কথায় আমি তাকে প্রশ্ন করি—কেন এ ব্যবসা ছেড়ে দিচ্ছ ?

ছেলেটি হতাশ হয়ে আমাকে বলল—কি করব কাকাবাবু, লোকে আমায় দেখলেই কেমন যেন ক্ষেপে যায়। জীবনবীমার ব্যবসা বোধ হয় আমার দ্বারা হবে না।

আমি বলি—দেখ, এই কাজ করেই অনেক লোকে অনেক টাকা রোজগার করছে, তুমি কেন পারলে না ? এর থেকে আমি এই বুঝব, তোমার মধ্যে এমন কোন দোষ আছে, যার জন্যে এই ব্যবসায়ে তুমি কৃতকার্য হতে পারলে না।

ছেলেটি কেমন যেন গুম খেয়ে গেল। তারপর আমাকে বলল—আপনি যখন বলছেন, তখন আর একবার চেষ্টা করে দেখি।

বছর দু'তিন ছেলেটির আর কোন খবর পাইনি। তারপরে খবর পেলাম ছেলেটি ব্যবসায়ে উন্নতি করেছে, গাড়ি কিনেছে, হাতে কিছু টাকাও জমিয়েছে।

একরকম বিস্মিত হয়েই তাকে প্রশ্ন করি—কি করে হল ?

ছেলেটি বলল—আপনি ঐ কথা বলবার আগে কাকাবাবু, পাছে লোকের সময় নষ্ট হয় এই ভেবে, আমি প্রথমেই তুলতাম জীবনবীমার কথা। ফলে ভদ্রলোকেরা হতেন আমার ওপর বিরক্ত, আর আমিও কাজ পেতাম না। আপনার ঐ কথা শোনার পর, আমি লোকেদের বাড়ি গিয়ে কেবল লক্ষ্য করতাম তাঁরা কি বিষয়ে কথা বলছেন, অথবা ভদ্রলোকের কি বিষয়ে শখ আছে জানবার চেষ্টা করতাম। তার ফলে জানতাম, কারুর আছে কুকুরের শখ, কারুর ফুলের শখ, কারুর বা অন্য কিছু।

যিনি যে বিষয়ে পছন্দ করেন, তাঁর কাছে গিয়ে সেই বিষয়ে কথা তুলতাম। ফলে দেখতাম ধীরে ধীরে তাঁরা আমার প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন। এমন বহুদিন গেছে যে, আমার প্রকৃত উদ্দেশ্যের বিষয়ে একটি কথাও বলিনি।

ধীরে ধীরে আমাদের বন্ধুত্ব হত। তারপর আমার উদ্দেশ্য সাধন করতে আর কতক্ষণ ! একরকম এইভাবেই আমি জীবন-যুদ্ধে জয়লাভ করেছি।

আর একবার আমি ট্রেনে যাচ্ছিলাম, আমার সামনে বসে-ছিলেন দুই ভদ্রমহিলা। হাবভাবে মনে হল সম্পর্কে তাঁরা দুই

'জা'। বড় যিনি, তিনি কথা আরম্ভ করলেন। তিনি বললেন—জানলে ভাই, আমার বাবা সেদিন বিদেশে যাচ্ছিলেন, ফার্স্ট ক্লাসে চড়ে যাচ্ছেন, বেজায় ভিড় গাড়িতে, বাবার বার্থ রিজার্ভ করা ছিল,—ইত্যাদি ইত্যাদি।

ছোট যিনি, তিনিও কম পাত্রী নন। তিনিও আরম্ভ করলেন—জানলেন দিদি, আমার বাবা, বরাবর গাড়ি রিজার্ভ করে আমাদের সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে যেতেন। সেবারে রিজার্ভ পাওয়া যায়নি। স্টেশনে গিয়ে মা বললেন—যাব না। সে কি ব্যাপার! অবশেষে বাবা, "ক্রু"কে ধরে একশো টাকা ঘুষ দিয়ে গাড়ি রিজার্ভ করলেন।

বড় হেরে গিয়ে আবার আরম্ভ করলেন—তাঁর বাবা কি করে কম্পার্টমেণ্ট রিজার্ভ করে গাড়িতে জুড়ে গিয়েছিলেন।

অবস্থা শেষ পর্যন্ত এমন জায়গায় পৌঁছল যে কম্পার্টমেণ্ট জোড়া তো ছোট কথা স্পেশাল ট্রেন ছাড়া, এবং স্টেশন-মাস্টারকে কুলিগিরি করাতেও তাঁরা পেছপা হলেন না।

এখন আমারই মত যাঁরা তাঁদের পাশে বসেছিলেন, তাঁরা সকলেই মুখ টিপে হাসতে লাগলেন আর তাঁদের মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে কি যে তাঁরা ভেবেছিলেন তা তাঁরাই জানেন।

এ ধরনের কথা, অধিকাংশ সময় দেখা যায়, একতরফা হয়। অপরে নীরব শ্রোতা হন। ফলে কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা যায়, বক্তা আর শ্রোতা পান না। ফলে, শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে গাল পাড়তে পাড়তে তাঁকে চুপ করতে হয়।

আবার এমনও দেখেছি, এই ধরনের কথাবার্তা দিনরাত কানে শুনতে শুনতে দুর্বলচিত্তের মহিলা হয়ে গেলেন অপ্রকৃতিস্থ। কারণ তিনি এই ধরনের কথার কোন জবাব দিতে পারতেন না।

এই ধরনের কথার কোন জবাব না দিতে পেরে তিনি কেবলই ভাবতে থাকেন সকলেই বুঝি তাঁকে উপহাস করে যাচ্ছে।

আর একবার এক বিবাহবাসরে দেখি, হঠাৎ একজন বরযাত্রীর সঙ্গে কন্যাযাত্রীর পরিচয় বেরুল। অমনি তাঁরা সকলের সামনে কথাবার্তা শুরু করলেন। তাঁদের ছেলেবয়সের দিনগুলো কেমন সুন্দর কেটেছে। হোস্টেলে তাঁরা কত আনন্দে ছিলেন। শিক্ষকদের তাঁরা কত ভালবাসতেন, মান্য করতেন। আজকাল-কার ছেলেরা এসব কিছুই করে না। দেশটা উচ্ছন্নে গেল। তাঁদের দিনগুলো, আজকের দিনগুলোর তুলনায় কত মধুর। অমুক বন্ধু কি চাকরি করছে। সে কেমন গুছিয়ে নিয়েছে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

তাঁদের এই ধরনের কথাবার্তার ফলে, ঘরের আরও দশ-বারোজন যাঁরা আমারই মত উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের চুপ করে থাকতে হল, একটাও কথা বলবার সুযোগ তাঁরা পেলেন না। বিবাহবাড়ির সমস্ত আনন্দই তাঁদের কাছে ব্যর্থ হয়ে গেল।

আবার দেখেছি, কোন এক ভদ্রলোক এলেন দেখা করবার জন্যে। হয়তো ঘরে আরও তিন-চারজন লোক আছেন। আগন্তুক ভদ্রলোক বাংলাদেশের কোন প্রাচীন বংশের দূর-সম্পর্কের আত্মীয়। কথাবার্তার ফাঁকে যেই তিনি কথা বলবার সুযোগ পেয়েছেন, অমনি আরম্ভ করলেন, অমুক রাজাবাহাদুর, যিনি সম্পর্কে আমার অমুক ছিলেন। তাঁর যা জিনিস ছিল, বা ঐ ধরনের, তিনি এই করতেন, তাই করতেন—সব কথা।

এতে সন্ধ্যার মজলিশটাই হল মাটি। আর কেউ কোন কথা বলবার সুযোগই পেল না।

আমার সব চাইতে খারাপ লাগে যখন লক্ষ্য করি দিনের শেষে স্বামী বাড়ি ফিরছেন ক্লান্ত হয়ে, অথচ স্ত্রী অপেক্ষা করছেন স্বামীকে অভ্যর্থনা করবার জন্য—তাঁর মনের সবটুকু বিষ উজাড় করে ঢেলে দিয়ে। স্বামী হয়তো কিছু বললেন না বা কোনদিন কথাকাটাকাটি হলেও, লোকে অবশ্য ওপর থেকে দেখল সামান্য দাম্পত্যকলহ। কিন্তু আমার মন তখনই বিষিয়ে ওঠে। কারণ আমি জানি, ওই ছোট্ট কলহের মধ্যে লুকিয়ে আছে অপ্রকৃতিস্থতার বীজ।

স্ত্রীর কাছ থেকে সহানুভূতিসূচক মিষ্ট কথা না শোনার ফলে কত জীবন যে নষ্ট হতে দেখেছি তার আর ইয়ত্তা নেই। আবার ঠিক তেমনি দেখেছি, স্বামীর কাছ থেকেও মিষ্ট কথা না পাওয়ার ফলে কত জীবন ব্যর্থ হয়ে গেছে।

তাই আপনাদের কাছে আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, সব সময়ে মনে রাখবেন বিখ্যাত সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের সেই অদ্ভুত কথাটি —"মুখের কথা আর হাতের ঢিল, একবার যদি ছেড়ে দেওয়া যায় তাকে শত চেষ্টার ফলেও ফিরিয়ে আনা যায় না।"

কথা বলবার আগে আমরা যেন একবার ভেবে দেখি, যেন আমাদের কথা লক্ষ্যস্থানে পৌঁছুতে পারে এবং তার সুফল ফলতে পারে।

সব সময় মনে রাখবেন একটুখানি কথার ভুলের জন্য বহু অনর্থই ঘটতে পারে।

ব্যক্তিত্ব

আপনি কি জানেন, আপনার একটি ছোট্ট এক-অক্ষরের কথার ওপর কত লোকের মনের শান্তি নির্ভর করছে ?

সেই ছোট্ট কথাটি আপনার কাছ থেকে না পেয়ে, কত লোকে মানসিক রোগগ্রস্ত হয়েছে ?

আপনি হয়তো ভেবে-চিন্তে প্রশ্ন করবেন—কি সেই ছোট্ট কথাটি, যার সাহায্যে আপনি অনেকের অশান্তি দূর করতে পারেন ?

আমি বলব—সে কথাটা আর কিছুই নয়, ছোট্ট এক-অক্ষরের একটি কথা—"বাঃ"।

আপনি হেসে বলবেন—এ আবার হয় নাকি ? ঐ ছোট্ট "বাঃ" কথাটির অভাবে কেউ আবার মানসিক বিকারগ্রস্ত হয় ?

আমি বলব—হ্যাঁ হয়, এবং মানসিক ডাক্তার হিসাবে, ঝুড়ি ঝুড়ি এর নিদর্শন আমি দেখেছি আর আজ সেই কথাই আপনাদের কাছে বলব।

প্রথমে ধরা যাক আমার সেই বন্ধুর ছেলেটির কথা। বন্ধু এসে হঠাৎ একদিন বললেন—ছেলে বিলেত থেকে ফিরে এসেছে ব্যারিস্টার হয়ে। কোর্টে যায় না, বলে, আইন-ব্যবসা ভাল লাগে না।

কেবল বই নিয়েই পড়বে। বিলেত থেকে ভালভাবে এম. এ.-ও পাস করে এসেছিল। কলকাতার একটা কলেজে অধ্যাপকের চাকরিও পেয়েছিল—কিন্তু সে কাজও ছেড়ে

দিয়েছে। বড় কুনো! ঘরে বসে থাকবে, কারুর সঙ্গে মিশবে না। আমি মরে গেলে ওর কি হবে বল তো? এত করে ছেলেকে মানুষ করলাম, তার এই পরিণাম!

আমি বলি—তোমার ছেলেকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও। দেখি তার জন্যে কি করতে পারি।

কথামত ছেলেটি এলো। দিব্যি ছেলে! মানসিক বিকারের কোন চিহ্ন নেই, বিশেষ মুখচোরাও নয়। তবে কেন এমন হলো?

তাকে জিজ্ঞেস করি—তুমি কেনই বা চাকরি ছেড়ে দিলে? বিলেত থেকে ব্যারিস্টারি পাস করে এসে, হাইকোর্টেই বা যাও না কেন?

ছেলেটি উত্তরে বলে—মক্কেলের মামলা হাতে নিলেই কাকাবাবু, আমার কেবলই মনে হয়, আমার নিজের সামান্য ভুলের জন্যে যদি মক্কেলের হার হয়ে যায়—তাহলে?

আমি বলি—কলেজে পড়ানোর কাজটা ছাড়লে কেন তবে?

ছেলেটি বলে—ছেলেরা গোলমাল করতো ক্লাসে!

আমি বলি—সে তো তারা করবেই, সেটাই তো তাদের ধর্ম।

একটু আমতা আমতা করে ছেলেটি বলে—কি জানি কেন, আমার কেবলই মনে হয়, আমার পড়ানোর দোষেই বুঝি তারা গোলমাল করছে। ভাল করে পড়াতে পারলে, ওরা বুঝি আমার কথা শুনতো, আর ভালভাবে পরীক্ষায়ও পাস করতো—তাই আমি কাজটা ছেড়ে দিলাম। তাছাড়া বাবা আমাকে অনেক কষ্ট করে ব্যারিস্টারি পড়িয়ে আনলেন, সেই ব্যারিস্টারিই আমি করতে পারছি না।—কথা শেষ করে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে।

বুঝলাম, একদিনে হবার ব্যাপার নয়, ছেলেটির মনঃসমীক্ষার প্রয়োজন! তা করতেও শুরু করলাম, এবং মনঃসমীক্ষা করতে গিয়েই জানতে পারলাম একটি অদ্ভুত ইতিহাস।

ছেলেটির বাপ, ছেলেবয়েস থেকে তাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তার ফলে হয়েছিল কি, অধিকাংশ সময়ই সে কাটাতো বাবার সঙ্গে। ছোট ছেলে, বিশেষ কিছু জানে না— এবং তার কাজে ভুল হতে পারে, এই ধারণার বশীভূত হয়ে, ছেলেটি কখন কি করবে না-করবে, তার বাবা বলে দিতেন।

শিশুসুলভ চপলতায় ছেলেটি যদি কিছু নিজে থেকে করতে চাইতো, তা তার বাপের মনঃপূত না হলে তাকে করতে দেওয়া হতো না। দিন দিন ছেলে যে বড় হচ্ছে, অত্যধিক স্নেহের প্রবণতায় বাপ তা ভাবতেও পারতেন না। তার ফলে তিনি একটি বুড়ো খোকার সৃষ্টি করলেন।

ছেলে স্কুলে যায়, বাপ পৌঁছে দেন স্কুলে। ছুটি হলে পাছে অন্য ছেলের সঙ্গে মিশে ছেলে নষ্ট হয়, তাই বাপ নিয়ে আসতেন ছেলেকে। রাস্তায় পাছে ছেলে গোবরে পা দিয়ে পড়ে যায়, সেই জন্যে রাস্তায় বাপ সদাসর্বদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে ছেলেকে ঘিরে রাখতেন। তার ফলে হলো কি ছেলেটির ঘটলো আত্মবিশ্বাসের অভাব। রাস্তায় একা চলতেও সে শিখলো না। এইভাবে তার কলকাতার ছাত্র-জীবন কাটলো।

বিলেত যাবার সময়, 'টুরিস্ট' অফিসের সাহায্যে বাপ ছেলেকে বিলেত পাঠান—পাছে ছেলের কোন অসুবিধা হয়। সেখানে থাকার ব্যবস্থা, কলেজে ভর্তি হওয়া ইত্যাদি সবই বাপ কলকাতায় বসে আগে থেকেই ব্যবস্থা করেছিলেন। তাই ছেলেটিকে কোনরকম ঝঞ্ঝাট পোহাতে হয়নি। আজ গোল

বেধেছে রোজগারের বেলায়। কারণ আইন-ব্যবসা চালাতে গেলে প্রয়োজন আত্মবিশ্বাস, আর নিজের মতকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করার উদ্যম। কারণ তার মুখের দিকে চেয়ে আছে তার মক্কেল। তারই সাহসে সে মামলায় লড়তে প্রবৃত্ত হবে। আর বিচারকের সামনে তাকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে নিজের মত। অথচ ছেলে-বয়েস থেকে কি করে মত প্রতিষ্ঠা করতে হয় তা সে শেখেনি। তাই সবরকম যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও সে আজ সংসারে প্রতিপন্ন হলো অকর্মণ্য।

আর একবার একটি মেয়ে এলো আমার কাছে মনঃসমীক্ষা করবার জন্যে। মেয়েটির অল্প বয়েস। বিয়ে হয়নি। একটা অফিসেতে সে চাকরি করে। ভীরু, দুর্বল চিত্তের মেয়ে। সম্প্রতি তার 'অবসাদ' রোগ দেখা দিয়েছে।

চেহারা ভাল বলে অনেক যুবক তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করতে চেয়েছিল। ভীরুস্বভাবের এই মেয়েটি কারুর প্রতি আকৃষ্ট হতে পারেনি, ভয়ে সকলের কাছ থেকেই নিয়েছে বিদায়।

ক্রমশঃ জানতে পারি, মেয়েটির যখন অত্যন্ত দুঃসময় তখন তার মনিব তাকে চাকরি দেন। মেয়েটির অবচেতন মনে তাই মনিবের প্রতি একটা কৃতজ্ঞতাবোধও জাগে, ফলে সে আপ্রাণ খেটে মনিবকে খুশী করবার চেষ্টা করে। কিন্তু মনিবটি ছিলেন অত্যন্ত দুর্মুখ।

"তোমার দ্বারা কিছু হবে না, সংসারে একটা অপদার্থ তুমি, কোন কাজেই তুমি আস না, কোন রকম চিন্তা করবার ক্ষমতাও তোমার নেই" ইত্যাদি ইত্যাদি ছিল মনিবের মুখের ভাষা।

ফলে মেয়েটিরও মনে বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল, সংসারের কোন কাজেই বুঝি সে সত্যই আসবে না। কোনও কাজই বুঝি তার দ্বারা হওয়া সম্ভব নয়। এমন কি নারীর স্বাভাবিক ঘর বাঁধবার আকাঙ্ক্ষাও তার মন থেকে নিয়েছিল বিদায়। পাছে সে ঘর ভালভাবে না বাঁধতে পারে, পাছে তার জীবনসঙ্গী আবার তাকে তার মনিবের মত অপমান করে—এই চিন্তাই তাকে কোন পুরুষের দিকে এগিয়ে যেতে দেয়নি।

তাকে বলি—কি ভয় তোমার? তোমার মনিবও মানুষ, তুমিও মানুষ। তারও চিন্তা করবার ক্ষমতা আছে, তোমারও আছে। কিসে ছোট তুমি তার চেয়েও?

মেয়েটি প্রথম প্রথম আমার কথা বিশ্বাস করতে চায় না। পরে ধীরে ধীরে সে আমার কথায় বিশ্বাস করে। অবশেষে আমারই প্ররোচনায়, একদিন মনিবের ঐরকম ভর্ৎসনার পর, সে হঠাৎ তার মনিবকে সর্বসমক্ষে বলে বসে—আপনি এইভাবে যে কথা বলছেন, এ কথার অর্থ? মনিব একটা মনগড়া অর্থ করবার চেষ্টা করেন। মেয়েটি বোঝে সে অর্থ অর্থই নয়, কেবল তাকে স্তোকবাক্য দেওয়া। ফলে মেয়েটির আত্মবিশ্বাস ফিরতে আরম্ভ করে। তার অবসাদ রোগ কেটে যায়। একটি সুশ্রী যুবকের সঙ্গে তার বিয়েও হয়েছে সম্প্রতি।

উপরোক্ত দুটো দৃষ্টান্ত থেকে আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারছি, যুক্তি দিয়ে যা সত্য বলে আমাদের কাছে প্রতিপন্ন হবে, তা আমাদের অনুসরণ করা উচিত। নিজের মতের সঙ্গে না মিললে অপরের মতকে অশ্রদ্ধা করা উচিত নয়, কারণ তার মতেরও একটা দাম তার কাছে আছে।

হয়তো আমার অশ্রদ্ধাপূর্ণ কথা শুনে সে তার নিজের মতের ওপর শ্রদ্ধা রাখতে পারবে না।

এ কথা যে কেবল বড়দের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে তা নয়, ছেলেদের জন্য ঐ একই ভাবে প্রযোজ্য।

যেমন ধরুন, পার্কে আপনি ছেলেকে বেড়াতে নিয়ে গেছেন। আপনার ছ'সাত বছরের ছেলে একটু চঞ্চল। আপনি যেই একটু অন্যমনস্ক হয়েছেন অমনি আপনার ছেলে কাছ থেকে সরে গিয়ে গাছে উঠতে আরম্ভ করেছে। তার শিশুসুলভ কৌতূহল তাকে এই কাজ করতে উৎসাহিত করেছে। হয়তো আপনার দেখে ভয় করবে। কিন্তু তখুনি ছুটে গিয়ে সকলকার সামনে "বাঁদর কি করছিস, এখুনি পড়ে হাত-পা ভাঙ্গবি"—বলে ঘা কতক বসিয়ে দেবেন না। কারণ তা যদি করেন, তাহলে ভবিষ্যতে কোন দায়িত্বপূর্ণ কাজ সে আর করতে চাইবে না বা পারবেও না। কারণ তখনই অবচেতন মন থেকে, আপনার সেই "শাসন" তাকে বাধা দেবে।

জানবেন, পৃথিবীতে কোন বড় কাজ বিপদ ছাড়া হয় না এবং সেই কাজকে সম্পূর্ণ করতে গেলে চাই ধৈর্য আর আত্মবিশ্বাস।

ভেবে দেখুন কলম্বাসের কথা। জাহাজের প্রত্যেকটি নাবিক বিদ্রোহ করেছে। জাহাজে যে কোন মুহূর্তে তাঁর প্রাণ-সংশয় হতে পারে। হয়তো তাঁর এই গোঁয়ারতুমির জন্য খাবার আর পানীয় জলেরও অভাব দেখা দিতে পারে। এত বিপদের ঝুঁকি নিয়েও কলম্বাস স্থিরচিত্তে এগিয়ে চলেছেন সাগরের বুকে। তাঁর স্থির বিশ্বাস, একদিন-না-একদিন তিনি ভারতবর্ষে যাবার পথ আবিষ্কার করতে পারবেন। এই আত্ম-

বিশ্বাসের সাহায্যেই তিনি সমস্ত বিপদ কাটিয়ে সেদিন আমেরিকার পথ আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন।

ছোট ছেলেকে যদি আমরা আত্মবিশ্বাসী না করে তুলি, তা হলে কেমন করে ভবিষ্যতে বিপদের মুখোমুখি সে দাঁড়াবে? অথচ "তুই কিছু পারলি না" বলে আমি বাপ হয়ে তাকে তখন অভিযুক্ত করব সব চেয়ে বেশী।

এই আত্মবিশ্বাসের অভাব যে মানুষের কত দিক দিয়ে হয়, তা আর একটা দৃষ্টান্ত দিলে বুঝতে পারবেন।

এক ভদ্রলোক একবার আমার কাছে এলেন। বয়স তাঁর পঞ্চাশের ওপর। সংসারে ছেলেমেয়ে সবই আছে। কেবল বছরখানেক হলো স্ত্রীবিয়োগ হয়েছে।

নিজের ব্যবসা ছিল, তাও আজকাল আর দেখতে ভাল লাগে না। বাড়িতে বসে থাকলেও বিরক্ত লাগে। কি যে করবেন তার ঠিক নেই। অবশেষে, আজ মাস ছয়েক হলো, অবসাদ রোগগ্রস্ত হয়েছেন তিনি। ছেলে, মেয়ে, নাতি, নাতনী, কারুর সঙ্গই তাঁর ভাল লাগে না। কি করেন তিনি?

সমীক্ষা করতে গিয়ে আমি জানতে পারি ভদ্রলোকের বিয়ে হয়েছিল কুড়ি একুশ বছর বয়সে। তখন থেকে তাঁর স্ত্রী মৃত্যুর দিন অবধি তাঁকে নিজের শাসনে রেখেছিলেন। যেমন, ভদ্রলোক কি জামাকাপড় পরবেন, তা তাঁর স্ত্রী ঠিক করে দেবেন। সন্ধ্যার পর কোথায় কতক্ষণ কাটাবেন, তাও স্থির করে দিতেন সেই মহিলা। এমন কি খবরের কাগজটিও তিনি স্বামীকে পড়ে শোনাতেন।

ভদ্রলোকের বাড়ির কোন ব্যাপারেই কথা বলবার অধিকার ছিল না। আজ তাই তাঁর স্ত্রী মারা যাওয়ায় ভদ্রলোক হয়েছেন

একেবারে নিঃসহায়, কারণ আর একজনের ব্যক্তিত্বে সম্পূর্ণ প্রভাবান্বিত হয়ে তিনি নিজের জীবন এতদিন কাটিয়ে এসেছিলেন। তার ফলে তাঁর নিজের ব্যক্তিত্বের ঘটেছে অভাব। আজ তাই সে প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে, তাঁর নিজের জীবন দুঃসহ হয়ে উঠেছে তাঁরই কাছে। এ যেন খাঁচায় আবদ্ধ সেই জীব, যাকে খাঁচা থেকে মুক্ত করে দিলেও কিছুক্ষণ বাইরে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়িয়েই যে মুহূর্তে সে বুঝলো তার পক্ষে বিচরণ করা কষ্টকর সেই মুহূর্তেই সে ফিরে আসে আবার সেই খাঁচায়। মেনে নেয় সে স্বেচ্ছায় বন্দিত্ব। কিন্তু মানুষের বেলায়ও ঐ একই কথা প্রযোজ্য। তাকে খাঁচায় পোরা হয় না বটে, কিন্তু ব্যক্তিত্বের খাঁচায় তাকে করা হয় আবদ্ধ।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা না বলে পারি না। এই ধরনের ব্যক্তিত্বহীন লোক, অনেক সময় দেখেছি, নিজের বিচার-বুদ্ধি থাকে না বলে অপরকে নিজের অসফলতার জন্য এঁরা দোষ দেন। শুধু দোষ নয়, সময় সময়, এই দোষ দিতে গিয়ে অপরেরও করেন ক্ষতি। নিজের ভাল ফল পান না।

একবার এক ভদ্রমহিলা এলেন আমার কাছে মনঃসমীক্ষা করাতে। মনঃসমীক্ষা করতে বসেই আমি বুঝতে পারি মহিলাটি অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে রয়েছেন। স্বামীর প্রতি তাঁর আর অভি-যোগের শেষ নেই। ভদ্রলোক কিন্তু এদিকে অত্যন্ত ধীর, স্থির, শান্ত। সমীক্ষা করতে করতে বুঝতে পারি মহিলা ছিলেন মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে। জন্মের পর থেকেই মহিলাটির মা, মহিলাটির ওপর করেছিলেন প্রভাব বিস্তার। ফলে মহিলাটি যুক্তি দিয়ে কোন জিনিসই বুঝতে শেখেননি কোনদিন। কি কারণে বিয়ের সময় পাত্রপক্ষ আর কন্যাপক্ষের মধ্যে ঘটেছিল

মতান্তর, তাই মেয়েটির মার মন জামাইয়ের ওপর হলো বিরূপ। জামাইয়ের অনুপস্থিতিতে মেয়ের সামনে অযৌক্তিক নানা কথা জামাইয়ের বিরুদ্ধে বলতেন। ফলে মেয়েও তাকে বিশ্বাস করে নিত সত্য বলে। তাই স্বামী-স্ত্রীতে মধুর সম্পর্ক স্থাপিত না হয়ে, স্থাপিত হলো এক তিক্ত সম্বন্ধ।

ছেলেটি স্ত্রীকে বাপের বাড়ি গিয়ে থাকতে বললে মেয়েটি যেতে চাইতো না। কারণ সেখানে তার অসুবিধাও ছিল প্রচুর। অথচ স্বামীকে সাহায্য না করে, সে সব সময় স্বামীর ছিদ্র অন্বেষণ করতো এবং তা না পেলে তার মায়ের মনগড়া কথা নিয়ে সে করতো ঝগড়া। ফলে তাদের দুজনের জীবনই খুব অল্প সময়ের মধ্যেই দুর্বিষহ হয়ে উঠলো। ক্রমশঃ সংসারপথে চলতে গিয়ে সুখ আর শান্তি না পেয়ে, মেয়েটি হলো উত্তেজিত, তার ফলে স্বামীকে সে দিনরাত অকারণে করতে লাগলো গালাগালি।

একদিন মেয়েটি এসে আমায় বললো—আজ স্বচক্ষে আমার স্বামীকে প্রেম করতে দেখেছি অপর মেয়ের সঙ্গে। অথচ আপনি কেবলই বলবেন, ও ভাল লোক।

চমকে উঠলাম কথা শুনে। ভদ্রলোককে আমি যতদূর জানি, এমনটি তো হবার কথা নয়।

আমি বললাম—তুমি কি করে বুঝলে তারা প্রেম করছিল ?

মেয়েটি বললো—আজ আমারই একজন অবিবাহিতা বান্ধবী এসেছিল আমার সঙ্গে দেখা করতে। আমি ভদ্রতার খাতিরে আমার স্বামীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। অথচ ওরা এমনই নেমকহারাম, আমি যেই পাশের ঘরে উঠে গিয়েছিলাম চা

আনবার জন্যে, সঙ্গে সঙ্গে দিব্যি গল্প জমিয়ে ওরা দু'জনে কত হাসাহাসি করছিল।

ব্যাপারটা আঁচ করে নিয়ে আমি বলি—তুমি কি করে বুঝলে ওরা প্রেম করছিল ?

মেয়েটি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল—এ আর শক্ত কথা কি ! আগে প্রায়ই আমার স্বামী আমাকে বলতো বাপের বাড়ি গিয়ে থাকতে। আমার মাকে সে কথা বলায় আমার মা বলেছিলেন—তা আর বলবে না, কারণ তুই সরে এলেই যে ওর প্রেম করতে সুবিধে হবে! তাইতো ওদের হাসতে দেখে আমি বুঝতে পারলাম ওরা প্রেম করছিল।

আমি বলি—তুমি নিজের কানে যে ব্যাপার শোননি, যে বিষয়ে তুমি কোন প্রমাণ পাওনি, যে বিষয়ে তোমার মাও কিছু জানেন না, কেবল কল্পনায় সেই বিষয় এনে, কেন অশান্তি করবার চেষ্টা করছো ?

মেয়েটি আমার কোন কথাই কানে নিল না। তার স্বামীকেও সে বোঝাবার কোন চেষ্টাও করলো না। ফলে সে তো নিজের জীবনে সুখ পেলই না, অপর কাউকেও সুখ সে দিতে পারলো না। মাঝখান থেকে আর একটি প্রতিভাবান ছেলের জীবনকে করলো নষ্ট।

এ থেকে আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারছি, ছেলেবয়েস থেকে যদি মেয়েটির ব্যক্তিত্ব তৈরী হতো, তাহলে তার দাম্পত্য-জীবনও সুখের হতো এবং স্বামীর জীবনও সফলতায় ভরে যেত।

তাই আপনাদের কাছে আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, নাক

সিঁটকে কাউকে কোন কাজ থেকে বিরত করবার চেষ্টা করবেন না, বরং ভাল-মন্দ বলে দিয়ে তার কাজে তাকে দিন উৎসাহ। তা হলে দেখবেন, এই ধরনের মানসিক জটিলতার সৃষ্টিও আর হবে না। হয়তো আপনার উৎসাহ আর "বাঃ" বলার সাহায্যে পৃথিবীর অনেক বড় কাজ, যা আপনি কল্পনাও করতে পারেন না, তা হয়তো ঘটে যেতে পারে, আর ঘটবে না যে, স্থিরভাবে একথা কেউ-ই বলতে পারবেন না।

জীব দিয়েছেন যিনি

'পরিবার নিয়ন্ত্রণ করুন, পরিবার নিয়ন্ত্রণ করুন।'—সরকারের পোস্টার পড়ছে, সিনেমায় স্লাইড দেখানো হচ্ছে, রেডিওয় বক্তৃতাও হচ্ছে। শুধু তাই নয়, সময় সময় পাড়ার নির্দিষ্ট পরিবার নিয়ন্ত্রণ অফিস থেকে মেয়েরা যাচ্ছেন বাড়ির গিন্নীর সঙ্গে দেখা করতে। দেখা যে হচ্ছে না তা নয়, দেখা হলেই তিনি হাত মুখ নেড়ে গিন্নীকে বুঝাবার চেষ্টা করছেন পরিবার নিয়ন্ত্রণ না করার কুফল।

আদমসুমারির রিপোর্ট থেকে তিনি দেখাচ্ছেন, ১৯২১ সালে যা লোক ছিল ভারতবর্ষে, ১৯৩১ সালে গণনা করে দেখা গেছে তা থেকে বেড়েছে শতকরা ১১ জন। '৪১ সালের গণনায় দেখা গিয়েছিল, '৩১ সাল থেকে বেড়েছে আরো শতকরা ১৩·৫ জন। আবার '৫১ সালের রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, '৪১ সালের উপর বেড়েছে ১৪·১ জন। সম্প্রতি সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে প্রতিবছর লোক বাড়ছে সত্তর লক্ষ। এইভাবে যদি লোক বাড়ে তা হলে কি ভয়ংকর ব্যাপার হবে বলুন তো ? আগামী চল্লিশ বছরের মধ্যে সারা ভারতে দাঁড়াবার জায়গাও থাকবে না।

বাড়ির গিন্নী একটু হেসে বলেন—কেন, জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি।

যিনি এতক্ষণ পরিবার নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে বুঝাচ্ছিলেন, তিনি এইবার মুশকিলে পড়লেন। তিনি বুঝলেন এতক্ষণ ধরে যা বক্তৃতা দেওয়া হয়েছে সব ভস্মে ঘি ঢালা হয়েছে। তাই একটু

চালাকি করে বললেন—ওটা আপনি ঠিক বললেন না; ওটা ঠিক জীব দিয়েছেন যিনি নন, বদলে গিয়ে হয়েছে জন্ম দিয়েছেন যিনি! অর্থাৎ আহার যোগাতে বাধ্য আপনি।

গিন্নী একটু মুশকিলে পড়েই বলেন—হ্যাঁগা বাছা, তাই নাকি গো! আমার ঠাকুর্দার ১৫টি ছেলে-মেয়ে। আমরা সবসুদ্ধ ভাই-বোনে, শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে, ১০৮টি! এই ধর না আমরাই ভাই-বোনে হলাম ১৪ জন। তা আমার পাঁচটা সন্তান জন্মাতে না জন্মাতেই তুমি এসে বলছো পরিবার নিয়ন্ত্রণ করতে?

সুর একটু নেমেছে দেখে, ভদ্রমহিলা জোর দিয়ে বলেন—একবার ভেবে দেখুন তো, আপনার ঠাকুর্দা ঠাকুমা খেতেন ২ টাকা মণের চাল। তাঁর ছেলে-মেয়েরাও খেয়েছেন ৩৷৷০-৪৲ টাকা মণের চাল। আর আপনারা ১০৮ জন হয়ে খাচ্ছেন খুব কম করেও ২৫৲ টাকা মণ। এইবার আপনার সব ভাই-বোনের যদি পাঁচ ছটি করে সন্তান হয় তা হলে সংখ্যায় দাঁড়ালো ৬০০ কি ৭০০। এখন তারা কত টাকা মণের চাল খাবে?

গিন্নীর এ দিকটা ভাবা ছিল না। তাই তিনি হঠাৎ এই কঠিন সমস্যার সামনে পড়ে মাথা চুলকুতে লাগলেন। আর সেই ফাঁকে পরিবার নিয়ন্ত্রণ অফিসের মেয়েটি কি করে ডাক্তারের সাহায্য নিয়ে পরিবার নিয়ন্ত্রণ করতে হয় সে সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে লাগলেন।

সে যা হবার হোক, আমার বক্তব্য বিষয় ঐ পরিবার নিয়ন্ত্রণ অফিসের মেয়েটিকে নিয়েও নয়, আর পাড়ার গিন্নীকে নিয়েও নয়। আমার বক্তব্য বিষয় হল পরিবার নিয়ন্ত্রণ আজ আমাদের দেশে দরকার হয়ে পড়েছে। নইলে সুদূর ভবিষ্যতে

চালের দাম যে কত হবে তা কেউ বলতে পারে না। শুধু খাওয়ার জিনিস কেন, স্থান সংকুলানও হবে কি না সন্দেহ। তাই পরিবার নিয়ন্ত্রণ আমাদের করতেই হবে।

এখন দেখা যাক, পরিবার নিয়ন্ত্রণ করা যায় কি উপায়ে! মানুষের জন্মের সঙ্গে থাকে আদিম কামনা। তাকেই চরিতার্থ করতে গিয়ে সে গাছের কোটরে বেঁধেছিল ঘর। আজ অবশ্য গাছের কোটরে তাকে আর ঘর বাঁধতে হয় না, সে গড়েছে নগর, গড়েছে বিরাট শহর।

কিন্তু তার আদিম প্রবৃত্তি তো কমেনি! তাই সে খুঁজে বেড়িয়েছে সঙ্গিনী। তারই ফলে বেড়ে চলেছে এই সৃষ্টির কাজ। কিন্তু পৃথিবীর পরিসর আর বাড়ছে না। তাই লোক-সংখ্যা যদি বেশী হয়ে যায় তা হলে স্থান আর খাদ্যের দুটোরই অভাব ঘটবে এ কথা আমরা আগেই বলেছি।

এখন দেখা যাক, কি কি উপায়ে মানুষ জন্মনিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

প্রথম ধরা যাক, কৃত্রিম উপায়ে। নানা রকম জিনিস ব্যবহার করে জন্মনিয়ন্ত্রণ করা হয়। কিন্তু এতে পুরুষদের যৌন আনন্দ অনেক সময় ব্যাহত হয়। সেই জন্য অনেকে এটাকে পছন্দ করে না।

দ্বিতীয় ধরা যাক, একটি বা দুটি সন্তানের পর যৌন সংসর্গ বন্ধ করে দেওয়া। কিন্তু সাধারণ মানুষ তা পারে না। এতে প্রয়োজন মানসিক শক্তি। আবার তা একজনের থাকলে চলবে না। থাকা উচিত উভয়েরই। নইলে দৈনন্দিন জীবনে দেখা দেবে অশান্তি।

তৃতীয়, অস্ত্রোপচারের সাহায্য নেওয়া। সাধারণতঃ

স্ত্রীলোকদের ওপরেই এই অস্ত্রোপচার করা হয়। তবে কিছুদিন ধরে পুরুষদের ওপরেও এর পরীক্ষা হচ্ছে। এই অস্ত্রোপচারের সাহায্যে স্ত্রীলোকের 'ফ্যালোপিয়ান টিউব' অর্থাৎ যেখানে সর্বপ্রথম পুরুষের শক্তি (শুক্রকীট) নারীর শক্তির (ওভাম) সঙ্গে মিলিত হয় এবং সন্তান সৃষ্টি হয়, সেইটি অস্ত্রোপচারের সাহায্যে পরিবার নিয়ন্ত্রণের জন্য বাদ দেওয়া হচ্ছে। এতেই সন্তানসৃষ্টির পথ রুদ্ধ হয়।

ঠিক বলতে পারব না, কতদিন আগে এই অস্ত্রোপচারের সূচনা হয়েছিল। তবে প্রায় চল্লিশ বছর আগে একজন কেরানী সন্তানভারে পীড়িত হয়ে প্রথমে তাঁর স্ত্রীর ওপর অপারেশন করতে কলকাতার মেডিকেল কলেজে রাজী হয়েছিলেন—সে কথা আমাদের জানা আছে। যে ডাক্তার সেই অস্ত্রোপচার করেছিলেন, সেদিন সেই ভদ্রলোককে তিনি তাঁর ক্লাসে ডেকে এনে সর্বসমক্ষে প্রশংসাও করেছিলেন। সবই হল কিন্তু শেষরক্ষা হল না। এই অস্ত্রোপচারের ফলে যৌনক্রিয়ার কোন ব্যাঘাত হয় না বটে, কিন্তু তার চেয়ে বড় ক্ষতি হয়ে যায় সময়ে সময়ে।

সে ক্ষতিটা আর কিছুই নয়—মানসিক রোগের উদ্ভব।

কবে বা কখন এই অস্ত্রোপচারের পর এই রোগ দেখা দেবে তা সঠিক করে কিছু বলা যায় না। আমার বেশীর ভাগ রোগী এই রোগে আক্রান্ত হয়েছেন অস্ত্রোপচারের পর দু' বছর থেকে ছ' বছরের মধ্যে।

এখন প্রশ্ন হল—এ রোগ হয় কেন!

ইতিপূর্বে আমার বহু লেখায় আপনাদের আমি জানিয়েছি যে-মনকে আমরা অনুভব করতে পারি তা বিরাট মনের সামান্য অংশ মাত্র। তাই বুঝতে-পারা মন দিয়ে আমরা অনেক সময়

রাজী হয়ে যাই এই ধরনের অস্ত্রোপচার করতে। কারণ সেই মন দিয়েই আমরা বুঝি বর্তমানের অর্থনৈতিক অবস্থায় আর বেশী সন্তান হলে আমাদের কষ্টই পেতে হবে।

কিন্তু যে মনটার কথা আমরা জানতে পারি না সেই অজানা মন হয়তো তখন পাড়ার গিন্নীর মতনই বলে—মাত্র পাঁচটি সন্তান, তাতে কি হয়েছে ?

ধীরে ধীরে সেই চিন্তা অজানা (অবচেতন) মন থেকে আসে সচেতনে আর সেই চিন্তা সচেতনে এলেই দেখা যায় মানসিক বিকৃতির লক্ষণ।

এই বছরেই প্রায় দশ মাস আগে এক ভদ্রমহিলা এলেন আমার কাছে অবসাদরোগগ্রস্ত হয়ে। ছ' সন্তানের জননী তিনি। পাঁচ বছর আগে তাঁর শেষ সন্তান জন্মাবার সময় তাঁর সন্তান হওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।

তাঁর কেবল ভয়—যদি তাঁর সন্তানগুলি মারা যায় ? তা হলে আর তো কেউ তাঁকে 'মা' বলে ডাকবে না ?

আমি বুঝিয়ে বলি—আপনি কেন এমন আশঙ্কা করছেন !

ভদ্রমহিলা কাঁদতে কাঁদতে বলেন—ডাক্তারবাবু, এক বছর আগে আমার সেজ ছেলেটার অসুখ করেছিল। আমি না খেয়ে দেয়ে কেবল ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছি, তিনি যেন তাকে বাঁচিয়ে রাখেন। এইবার তিনি আমার কথা শুনেছেন। ভবিষ্যতে আমার কোন অপরাধের জন্যে যদি না শোনেন তা হলে ? আমি তো আর মা হতে পারব না ?

কি উত্তর দেব ! অন্য দিকে চেয়ে রইলাম।

আর একবার একটি রোগীকে দেখতে গিয়ে দেখি,

ভদ্রমহিলা কেবলই কাকে যেন দু' হাত বাড়িয়ে কোলে নেবার চেষ্টা করছেন, আর অঝোরঝরে কাঁদছেন।

আমি প্রশ্ন করি—কাকে কোলে নিচ্ছেন মা, কাঁদছেন কেন?

পায়ের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে ভদ্রমহিলা বললেন—দেখছেন না, স্বয়ং নন্দগোপাল আসতে চায় আমার কোলে। আমি যে যশোদা! কিন্তু ডাক্তারবাবু, ওরা ভুলিয়ে আমার ছেলে হওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। আপনি দয়া করে সেটা ঠিক করে দিন। তা হলে গোপাল আমার বুকে আসতে পারবে! তাকে নিয়ে আমার সব দুঃখ ঘুচে যাবে। এ কথা আমি কেবল আমার নিজের জন্যে বলছি না—স্বয়ং ভগবান জন্ম নিলে পৃথিবীরও তো উপকার হবে!

সেদিন গাড়িতে বসে কেবলই এই চিন্তাটাই মনে এসেছিল—বিজ্ঞানে যেমন একদিকে উন্নতিও হয় তেমনি সময় সময় অপর-দিকে ক্ষতিও হয় প্রচুর।

আর একবার এক ভদ্রমহিলা এলেন আমার কাছে চিকিৎসিত হতে। বয়স ৩০এর ওপর। ছ' সন্তানের জননী তিনি। বছর চার পাঁচ আগে শেষ সন্তানের জন্মের সময় তাঁর ছেলে হওয়া বন্ধ হয়েছে।

ভদ্রমহিলা তার পর থেকে বেশ ভালই ছিলেন। হঠাৎ গত বছর মাঘ মাসে এক তান্ত্রিক সাধুর কাছে তিনি দীক্ষা নেন। শ্মশানে গিয়ে মাঝে মাঝে ধ্যান-জপও করতেন। এ ছাড়া ধর্মীয় বইপত্র পড়া ছিল তাঁর নিত্যকার অভ্যাস। তাঁকে দেখলে তখন মনে হত অত্যন্ত নিষ্ঠাবতী মহিলা তিনি।

ক্রমশঃই ধ্যান-জপ বাড়লো। সংসারের কর্তব্য কম হল। কমতে কমতে এমন অবস্থা হল—কে যে কি খায়, কে যে কি

করে তা কিছুই তিনি দেখাশোনা করেন না। কেবল নিজের খেয়ালেই তিনি মত্ত থাকেন। এই মত্ত থাকায় অবশ্য কারুর বিশেষ ক্ষতি হত না। ক্ষতি হল তখনি যখনি তিনি সব পুরুষের মধ্যে শিবঠাকুরকে দেখতে পেতেন!

একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। কিছুদিন আগে থেকেই স্বামীকে ভদ্রমহিলা শিব বলতেন, আর নিজেকে ভাবতেন মহাকালীরূপে।

সব পুরুষের সঙ্গেই তিনি যৌন সংসর্গ করতে চান। কারণ সব পুরুষই তাঁর কাছে তখন শিব।

শুধু এই নয়, এতদিন তাঁর সংসারে এক বিধবা ননদ ছিলেন। ভদ্রমহিলা তাঁকেও আর সহ্য করতে পারলেন না। শেষ কথা তিনি তাঁর স্বামীকে জানিয়ে দিলেন—যদি তুমি তোমার বোনকে ভালবাস তা হলে বেশ তুমি তোমার বোনকে নিয়েই থাকো, আমি যেখানে হয় ঘুরে বেড়াব। জানব পৃথিবীতে আমার কেউ নেই। অগত্যা অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্বামী বোনকে নিয়ে গিয়ে অপর জায়গায় রাখলেন। যাবার সময় দশ বছরের ভাগ্নেটিকে ভদ্রলোক যেতে দেননি, নিজের কাছেই রেখেছিলেন।

ভদ্রমহিলা তখন সকলকে বলে বেড়াতে লাগলেন—তাঁর ননদের মত বড় শত্রু বোধহয় পৃথিবীতে কেউ নেই। কারণ ঐ যে দশ বছরের ছেলেকে রেখে গেল সে, আমার সংসারে থেকে ঐ ছেলেই আমাকে বিয়ে করবে আর আমাকে নিয়ে থাকবে। তখন ননদ হবে আমারই শাশুড়ী।

আপনারা বলবেন—এ তো পাগলের প্রলাপ। প্রলাপ বটে কিন্তু এর থেকে বেরিয়ে আসছে অবচেতন মনের অনেকখানি সত্যি, সেই কথাই এখন বলব।

কি স্ত্রী কি পুরুষ, সকলের মধ্যেই আছে হিংসা, আর আছে সুপ্ত বহুবিবাহের ইচ্ছা।

সেই বহুবিবাহের সুপ্ত ইচ্ছার ফলে সেই ভদ্রমহিলা অন্য পুরুষের মধ্যে দেখেছিলেন তাঁরই স্বামীর প্রতিচ্ছবি। তার থেকে দশবছরের ছেলেও বাদ যায়নি। আর হিংসা আছে বলে সেদিন ভদ্রমহিলা তাঁর ননদকে সহ্য করতে পারেননি। ভাই-বোনের মধ্যেও একটা যৌন সংসর্গের কল্পনা তিনি করেছিলেন।

ভদ্রমহিলা কি কেবল অপ্রকৃতিস্থ বলে এই কল্পনা করে-ছিলেন? তা যে নয়, নিচের ঘটনাটা পড়লেই আপনারা সে কথা বুঝতে পারবেন।

একবার আমার কাছে এক ভদ্রলোক এলেন। প্রতিরাত্রে তিনি স্বপ্ন দেখেন, এবং স্বপ্নগুলি অদ্ভুত ধরনের। ভদ্রলোক স্ত্রীকে ভালবাসেন, তাঁর দুটি সন্তান। স্ত্রী ছাড়া জানেন না আর কিছুই।

আমি তাঁকে বলি—স্বপ্নগুলি লিখে রাখবেন তো।

প্রথম রাত্রে তিনি স্বপ্ন দেখলেন—তিনি এক অপরিচিত মেয়ের সঙ্গে কোথায় যেন বেড়াতে গেছেন। জায়গাটা সুন্দর। বেড়াতে বেড়াতে তাঁরা উঠলেন একটা পাহাড়ে। পাহাড়টার পাশেই রয়েছে একটা বিরাট খাদ। খাদের কাছে যেতেই ভদ্রমহিলা পা হড়কে পড়ে গেলেন খাদের মধ্যে। ভদ্রমহিলাকে পড়তে দেখে ভদ্রলোক ভয় পেলেন আর বিস্মিত হয়ে দেখলেন যিনি পড়ে যাচ্ছেন তিনি অচেনা কেউ নয়, তাঁরই স্ত্রী।

আবার তিনি আর একদিন স্বপ্ন দেখলেন, তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে তাঁরই আর এক বন্ধুর বিয়ে হয়েছে এবং তাঁরা ঘুরে বেড়াচ্ছেন মনের আনন্দে।

বেশীর ভাগ স্বপ্নই থাকতো তাঁর স্ত্রীকে অবলম্বন করে।

অনুসন্ধান করে পরে জানতে পেরেছিলাম, ভদ্রলোকের স্ত্রীর দুটি সন্তান হয় 'সিজারিয়ান অপারেশন' করে। তার পর ডাক্তারেরা বাধ্য হয়ে ভদ্রমহিলার সন্তানধারণের ক্ষমতা নষ্ট করে দেন। অবশ্য এ কাজ তাঁরা করেছিলেন রোগিণীর ভবিষ্যৎ স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে। সহবাসের ফলে আর সন্তান হবে না, নির্ভাবনায় স্ত্রী অপরের সঙ্গে সংসর্গ করতে পারবে—ভেতর ভেতর এই কথা চিন্তা করেই ভদ্রলোকের মনে হয় ঈর্ষা। সেই ঈর্ষা নানা আকারে দেখা দেয় তাঁর স্বপ্নের মধ্যে। তাই কখনও তিনি দেখেন তাঁর স্ত্রী পড়ে যাচ্ছেন খাদের মধ্যে, আবার কখনও দেখেন তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন অপর পুরুষের সঙ্গে।

আপনারা বলবেন—এ তো মানসিক বিকৃতির লক্ষণ।

আমি বলব—এ ধরনের বিকৃতি বোধ হয় অল্পবিস্তর বহু বিবাহিত স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে আছে।

যেমন ধরুন ঃ—রামবাবু ফিরে এলেন অফিস থেকে। এসেই দেখলেন তাঁর বন্ধু শ্যামবাবু অপেক্ষা করছেন তাঁরই জন্যে। তাঁর স্ত্রী হাসিমুখে শ্যামবাবুর সঙ্গে কথা বলছেন। কোনরকমে ভদ্রতা বাঁচিয়ে রামবাবু শ্যামবাবুকে বিদায় দিলেন। তারপর হয়ে উঠলেন ভীষণ গম্ভীর।

স্ত্রী একটা কি কাজের কথা বলতে এসেছিলেন, রামবাবু অমনি গম্ভীর হয়ে বললেন—আমাকে কেন, শ্যামকে বল!

ঠিক অপর দিকে গৃহিণীর নিজের বোন এসেছেন দিদির বাড়ি বেড়াতে। স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে আপনি শ্যালিকার সঙ্গে একটু গল্প করছেন, কিংবা কোন কারণে হাসছেন ঠিক সেই

সময় আপনার গৃহিণী ঢুকলেন ঘরের মধ্যে। গম্ভীর হয়ে তিনি বললেন—হ্যাঁরে পুঁটি! তুই ক'দিন থাকবি রে?

আপনি ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারলেন না। একান্তে পেয়ে গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করলেন কি ব্যাপার ঘটেছিল?

কোন উত্তর নেই।

অনেক সাধ্যসাধনার পর তিনি বললেন—আমাকে কেন, তোমার পেয়ারের শালীকে বলগে যাও না।

এ ধরনের ঘটনা আমাদের প্রত্যেককেই নিত্যনৈমিত্তিক কিছু-না-কিছু প্রত্যক্ষ করতে হচ্ছে।

যাক, আমার বলবার বিষয় তা নয়। এখন ফিরে যাই আমার সেই পূর্ব বিষয়ে।

একবার এক ভদ্রলোক এলেন আমার কাছে চিকিৎসিত হতে। ভদ্রলোক সদাসর্বদা চান তাঁর স্ত্রীর কাছে থাকবেন, এবং তিনি তাঁর সঙ্গে যৌন সংসর্গ করবেন। স্বাস্থ্যের দোহাই, পায়ে ধরে কান্না, কিছুই টেঁকে না তাঁর কাছে।

'মনঃসমীক্ষা' বা 'সিটিং' দিতে গিয়ে জানতে পারি, ভদ্রলোলের স্ত্রীর দু'বছর আগে অস্ত্রোপচার হয়েছে। ভদ্রলোকের মনে তাই সন্দেহ, এখন অন্য কোন পুরুষের সঙ্গে তাঁর স্ত্রী যদি যৌন সংসর্গ করেন তা হলে তিনি জানতেও পারবেন না। তাই তিনি সদাসর্বদা তাঁর স্ত্রীকে কাছে চান আর উপরোক্ত কার্যের দ্বারা তাঁকে শান্ত রাখতে চান।

আর একবার এক ভদ্রমহিলাকে নিয়ে এলেন তাঁর স্বামী। ভদ্রলোক নিজে স্কুলে মাস্টারী করেন। সকাল-বিকেল ছাত্র-ছাত্রীর টিউশনি করেন। কারণ তিনি হচ্ছেন সাতটি সন্তানের পিতা। সংসারে আয়ও বেশী নয়। এই সমস্ত গণ্ডগোল এড়াবার

জন্যেই ভদ্রলোক অস্ত্রোপচার করেছেন নিজের ওপর। ফলে আজকাল দিনরাত তাঁর স্ত্রী সন্দেহ করছেন, ছাত্র-ছাত্রী পড়াবার নাম করে তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে অন্য মেয়ের সঙ্গে প্রেম করছেন এবং অবিবাহিতা ছাত্রীরাও তাঁর সন্তান হবে না জেনে তাঁর সঙ্গে যৌন সংসর্গ করছে।

কথার জ্বালা তো আছেই তার ওপর আছে ভদ্রমহিলার যখন তখন সহবাসের তাগিদ। ছেলে-মেয়েরা বড় হয়েছে, জায়গাও কম। শুধু তাই নয়, এ তাগিদ মেটাতে গিয়ে ভদ্রলোক হারাচ্ছেন তাঁর নিজের স্বাস্থ্য।

শারীরিক আর মানসিক এ দু'জায়গায় তিনি হচ্ছেন ক্লান্ত। তার ওপর অশান্তিরও শেষ নেই। এ ছাড়া দেখেছি অস্ত্রোপচার করার পর রোগিণীর দেহে বুকের কাছে বা তলপেটে নানা রকম ব্যথা ধরতে, যার যন্ত্রণায় তাঁরা হয়ে পড়েন অস্থির। অথচ কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে শারীরিক কোন রোগই আমরা পাইনি। শুধু তাই নয়। ১৯৫৭ সালে এক ভদ্রমহিলা অস্ত্রোপচারের পর আমার কাছে চিকিৎসিত হতে এলেন। তাঁর বয়েস পঁচিশের বেশি নয়। অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারিণী তিনি। অথচ আজকাল কেমন যেন দুর্বল বোধ করেন। কোন কাজ করতে গেলে গা কাঁপে। সারা গায়ে দেখা দিয়েছে এলার্জি (অর্থাৎ আমবাত জাতীয় রোগ)। রোগের কোনও কারণই তাঁর খুঁজে পেলাম না আমি।

নানা দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায়, অস্ত্রোপচারে জন্ম-নিয়ন্ত্রণ করলে, তাতে যেমন সুফল পাওয়া যায় তেমনি গোলাপের মতন এতেও আছে কাঁটা। কেবল গোলাপের সুমিষ্ট গন্ধ দিয়ে তৈরী এ জিনিস নয়। এতে হাত দিতে গেলে হাতে কাঁটাও

আমাদের ফুটতে পারে, সে কথা আমাদের মনে রাখা উচিত।

কিছুদিন আগে ভারত সরকারের আমন্ত্রণে দিল্লিতে এসেছিলেন বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক জুলিয়ান হাক্সলে। এক পরিবার নিয়ন্ত্রণের প্রদর্শনী খুলতে গিয়ে তিনি বলেন—এত খরচ করে কি হবে। তার চেয়ে ভারতবাসী যদি তাদের ধর্মানুযায়ী সংযম অভ্যাস করে তা হলে স্বভাবতঃই পরিবার নিয়ন্ত্রিত হবে। কোনও রকম কৃত্রিম উপায় তা হলে আর অবলম্বন করতে হয় না। আর ভারতবাসীর কাছে তার প্রচারও সহজেই হতে পারে।

বন্ধুত্ব

"প্রকৃত বন্ধু কোথায়—প্রকৃত বন্ধু কোথায়—যার সঙ্গে কথা বলে দু'দণ্ড আমি প্রাণ জুড়োতে পারব?"—এ কথা শুনতে শুনতে আমার কান পচে যাবার যোগাড়। সত্যিই কি পৃথিবীর মানুষগুলি হঠাৎ এমন হয়ে গেছে যে কারুর সঙ্গে কেউ বন্ধুত্ব করতে চায় না, না, আমাদেরই মধ্যে এমন কোন দোষ দেখা দিয়েছে যার জন্য আমরা বন্ধু পাই না?

উত্তরে আমি বলব, মানসিক ডাক্তার হিসেবে আমি দেখেছি, আমাদের নিজেদের ভেতর ছোটখাটো দোষ থাকার দরুনই আমরা বন্ধু পেলেও তা রাখতে পারি না। আর বন্ধু না রাখতে পারার ফলে মনের মধ্যে দেখা দেয় নানারকম জট, এবং সেই জটই পরে মানসিক রোগ বা দৈহিক রোগ হিসেবে দেখা দেয়।

যেমন ধরুন, এই তো সেদিন একটি মেয়ে আমার কাছে এসেছিল চিকিৎসিত হতে। অবসাদরোগগ্রস্তা ছিল সে। দিব্য দেখতে সুন্দর। কলেজের থার্ড ইয়ারে পড়ে। পড়াশুনায় আগে ভালই ছিল। কিন্তু আজকাল মেয়েটির আর কিছুই ভাল লাগে না। কলেজেও যেতে চায় না। নিজের পড়ার ঘরে বসে কেবলই কাঁদে।

দু'চারদিন মনঃসমীক্ষার পর আমি বুঝতে পারলাম, মেয়েটির দোষ হচ্ছে কথা বলতে গিয়ে সে তোলে তার শাড়ি আর গহনার কথা। তার বাবার জমানো টাকার অঙ্কের কথা। ফলে অন্য মেয়েরা তাকে দাম্ভিক ভেবে এড়িয়ে যায়। এক্ষেত্রে যে দম্ভ

একেবারে নেই সে কথা আমি বলি না। তবে এক্ষেত্রে মেয়েটি ছিল সরল। সে সদাসর্বদা ভাবতো ঐশ্বর্যের গল্প করলেই বুঝি অন্য মেয়েরা মন দিয়ে শুনবে। কিন্তু অপরে তার কথা শুনবে কেন ? তাই সে হল তাদের কাছে অবাঞ্ছিত। ফলে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতে গিয়ে মেয়েটি হল অবসাদ-রোগগ্রস্তা।

আবার দেখেছি কি ছেলে কি মেয়ে, সদাসর্বদা নিজের দলের মধ্যে চায় দলপতি হতে। একবারও ভেবে দেখে না তার সে যোগ্যতা আছে কিনা। যোগ্যতা না থাকলে, অন্যরা তাকে দলপতি মনোনীতও করে না। এই মনোনয়ন না পেলে, ফল ফলে তার মনে। বার বার এই ধরনের ঘা খেতে খেতে পরে দেখা যায় তার মানসিক রোগ। আমার এক দূরসম্পর্কের আত্মীয় ছিলেন। তিনি কলকাতার বাইরে চাকরি করতেন। একাই থাকতেন সেখানে। আত্মীয়, বন্ধুবান্ধব সকলেই থাকতেন কলকাতায়। তাঁর একটা অদ্ভুত অভ্যাস ছিল, কলকাতায় ফিরেই তিনি প্রথমেই বলতেন—আমাকে কালই চলে যেতে হবে। অথচ তিনি হয়তো একমাস ছুটি নিয়ে এসেছেন কলকাতায়। তাঁর স্ত্রী হয়তো অনুনয়-বিনয় করে বলেন—হ্যাগা, এরি মধ্যে যাবে, কতদিন পরে এলে, থাক না আরও দুটো দিন।

ভদ্রলোক উত্তপ্ত হয়ে বললেন—হ্যা, তোমাদের গুষ্টিবর্গের চলবে কি করে ?

একটা প্রচণ্ড আঘাতে স্ত্রীর মুখ হল বন্ধ। বিমিয়ে যায় আবহাওয়া।

অপর দিকে রাস্তায় বন্ধুবান্ধবরা তাঁকে দেখেই আনন্দে মুখরিত হয়ে বললেন—কিরে, কবে এলি ?

হেসে তিনি জবাব দিলেন—এই কাল এসেছি, আবার কালই চলে যাব।

বন্ধুরা বলেন—কালই চলে যাবি কেন, সামনে কালীপুজো আসছে। আমাদের ক্লাবে তো তুই বরাবর গান গাইতিস। বড় ভাল লাগতো। ছুটি বাড়িয়ে নিয়ে আরও দু'চার দিন থেকে যা না ভাই!

আচ্ছা, দেখা যাক্,—বলে ভদ্রলোক পাশ কাটালেন।

এইরকম মানুষকে লোকে দু'চারবার অনুরোধ করে, কিন্তু তাঁর অন্তরের ইচ্ছে প্রত্যেক মানুষ তাঁকে অনবরত খোশামোদ করে যাক। কিন্তু তেমন খোশামোদ মানুষ তাঁকে করবে কেন?

ফলে এই ধরনের ভদ্রলোক বা ভদ্রমহিলারা যাঁরা অকারণে নিজের দাম বাড়াতে চান, তাঁরা হন নির্বান্ধব। তখন তাঁদের মন তাঁদের সঙ্গে শত্রুতা করে। সারা জগৎ তাঁর কাছে মনে হয় এক শত্রুপুরী। কাউকেই তিনি আর অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করতে পারেন না।

আর একবার এক ভদ্রমহিলা এলেন আমার কাছে। লক্ষণ —ভীষণ উত্তেজনা। ভদ্রমহিলাকে চিকিৎসা করতে গিয়ে বুঝতে পারলাম, তাঁর যত রাগ এক বান্ধবীর ওপর, আর নিজের স্বামীর ওপর।

এমন ঘটবার কারণ? কিছুই বুঝতে পারলাম না। পরে তাঁর স্বামীর মুখ থেকে সমস্ত ঘটনা শুনে ব্যাপারটা খানিকটা বুঝতে পেরেছিলাম।

ভদ্রমহিলার নতুন বিয়ে হয়েছে। বি. এ. পাস। একাই থাকতেন তাঁর স্বামীর সঙ্গে।

একদিন স্বামীকে আবদার করে বলেন—একা থাকি, ভাল লাগে না, তুমি তো দিনরাত কেবল কাজ নিয়েই থাক। কলকাতায় আমার এক বন্ধুর সঙ্গে সেই ছেলেবয়েস থেকে বি. এ. ক্লাস পর্যন্ত পড়েছি। তারও এখন পুজোর ছুটি আসছে। গান গাইতে পারে ভাল। দিব্যি হাসিখুশি। লিখে দোব তাকে আসতে ?

একে নতুন স্ত্রীর আবদার তার ওপর সত্যি কথাই তো, ভদ্রমহিলা দিনরাত একাই থাকেন। ভদ্রলোক ভাবলেন—আসুক না কেন, বিরাট বাঙলোটা তো খালিই পড়ে আছে, দু'চারদিন হাসি গল্প আর খুশিতে ভরে থাকবে !

স্বামীর অনুমতি পেয়েই স্ত্রী চিঠি লিখলেন তাঁর বান্ধবীকে। পুজোর দীর্ঘ ছুটি সামনে। পরীক্ষারও অনেক দেরি। চিঠি পেয়ে ভদ্রমহিলা সেখানে এসে হাজির। হাসি গল্পে ভরে উঠলো চতুর্দিক।

বেশ কাটছে সকলকার। কিন্তু গিন্নীর হঠাৎ মনে হল, তাঁর বন্ধু বুঝি তাঁর স্বামীর দিকে হাত বাড়াচ্ছেন। আর তাঁর স্বামীও ইদানীং যেন তাঁর বান্ধবীর দিকে মনোযোগ দিচ্ছেন।

খাওয়ার টেবিলে তাঁর বান্ধবীর সঙ্গেই গল্প করেন। রাত্রে ক্লাব থেকে যেন ইদানীং তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরছেন। তিনি যখন গৃহের অন্য কাজে ব্যস্ত থাকেন, তখন বসবার ঘরে ওঁরা যেন কি কথাবার্তা বলেন।

প্রথমে সন্দেহ, পরে রজ্জুতে সর্পভ্রম। স্বামীকে ঠেস মেরে কথা। বন্ধুকে ঠেস মেরে কথা। প্রথমটা কোন পক্ষই গায়ে মাখেননি। গায়ে যখন তাঁরা মাখলেন তখন ভদ্রমহিলা একরকম অপমানিত বোধ করে সেখান থেকে গেলেন চলে। আর

ভদ্রলোক প্রাণপণে স্ত্রীর বিশ্বাস আনবার চেষ্টা করতে লাগলেন। সে বিশ্বাস আর ফিরলো না। কারণ ভদ্রমহিলা ততক্ষণে বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন। কল্পনার সঙ্গে যুদ্ধ করে তিনি তখন নিজেই অনবরত ক্ষতবিক্ষত হচ্ছেন। রাতে তাঁর ঘুম চলে গেছে। রোগের অন্য লক্ষণও দেখা দিয়েছে। এর কারণ কি জিজ্ঞাসা করলে, আমি বলব—'ঈর্ষা'।

তাই বলছি—যাঁর সঙ্গে আপনার বন্ধুত্ব হবে, তাঁকে আপনার ভালবাসতে হবে। মন থেকে ঈর্ষা দূর করতে হবে এবং নিজেকে সদাসর্বদা সন্দেহ থেকে মুক্ত রাখতে হবে।

যদি আপনি চিন্তা করেন, আপনি যাকে বিশ্বাস করেন তিনি আপনার চেয়ে সব দিক দিয়েই বড়, তা হলে সেখানে হবে না বন্ধুত্ব, সেখানে দেখা দেবে complex.

অথবা আপনি যদি মনে করেন যাঁর সঙ্গে আপনি মিশছেন তিনি আপনার সঙ্গে মেশবার যোগ্য নন, আপনি কেবল দয়া করেই তাঁর সঙ্গে মেশেন বা কৃপা করেন, তা হলেও আপনার বন্ধুত্ব টিকবে না। একটা দৃষ্টান্ত দিলে কথাটা বুঝতে পারা যাবে ভাল করে।

রামবাবুর সঙ্গে শ্যামবাবুর বন্ধুত্ব অনেকদিনের। রামবাবু বড়লোকের ছেলে আর শ্যামবাবু মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ছেলে।

দু'জনে সন্ধ্যের সময় একসঙ্গে কাটান। একদিন দু'জনেই বসে গল্প করছেন, সংসারের খরচা বেড়ে যাচ্ছে। এই প্রসঙ্গ চলতে চলতে হঠাৎ রামবাবু বললেন—এই দেখ না আমার চায়ের খরচা কি কম, বার ভৃতকে চা খাওয়াতে হয়।

শ্যামবাবুও সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে একজন ভৃত কল্পনা করলেন, এবং মনে মনে ভাবলেন যে, তিনি রোজ সন্ধ্যাবেলা চা-জলখাবার

খান বলে রামবাবু এ রকম ইঙ্গিত করছেন। ফলে শ্যামবাবু গম্ভীর হয়ে উঠে গেলেন সেখান থেকে, আর এলেন না।

শ্যামবাবু দু'দিন আসছেন না দেখে তাঁর অসুখ করেছে ভেবে রামবাবু খোঁজ করতে গেলেন।

বন্ধুকে সুস্থ দেখে বললেন—কি রে, যাসনি কেন ক'দিন ?

শ্যামবাবু গম্ভীর হয়ে বলেন—না ভাই, চায়ের দাম বেড়েছে।

প্রথমটা রামবাবু বুঝতে পারেননি। তাই জিজ্ঞেস করলেন —চায়ের দাম বেড়েছে মানে ?

শ্যামবাবু বলেন—না ভাই, তুমি বড়লোক, বার ভূতকে তোমার চা খাওয়াতে হয়। আমি আর ভূত হয়ে তোমার ঘাড়ে চাপি কেন ?

—ভূত, ভূত মানে ? ঘাড়ে চাপা এসব কি বলছিস ?

শ্যামবাবু বললেন—কেন ভাই, তুমিই তো সেদিন বললে। তা তুমি ওধরনের কথা বলতে পার, তুমি বড়লোক তো !

ব্যাপারটা বুঝতে পারার পর রামবাবুরও রাগ চড়ে গেল। একটা দুশো আড়াইশো টাকার কেরানীর মুখে এসব কি কথা ! তাই কোন কথা না বলে রামবাবু সেখান থেকে উঠে গেলেন। ফলে, নতুন করে সেদিন রাত্রে রামবাবুর গৃহিণী শুনলেন— রামবাবু বলছেন—শ্যামের কি এমন অবস্থা যে তার সঙ্গে খোশামোদ করে মিশতে হবে ! ওর সঙ্গে মেশা আর আমার ম্যানেজারের সঙ্গে আড্ডা মারা একই কথা !

অপর দিকে শ্যামবাবুর গৃহিণী শুনলেন—শ্যামবাবু বলছেন —রাম কালোবাজারে পয়সা করেছে, তার এখন মেজাজ কি ! ধরাকে সরা জ্ঞান করে। আমার মত মানুষকে সে আর মানুষ বলেই বিবেচনা করে না। না করুক, আমিও তার চেয়ে

কোন অংশে কম নয়। নাইবা রইলো আমার বাড়ি আর গাড়ি।

ফলে এতদিনকার বন্ধুত্ব একমুহূর্তেই শেষ হয়ে গেল। দু'জনেই দু'জনকার ওপর অভিমান পোষণ করতে লাগলেন।

এই রকম তিল থেকে তালের হাত থেকে বাঁচতে আমাদের সাবধান হতে হবে।

একজন বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ্ বলেছেন—বন্ধুত্ব করতে গেলে, বন্ধুর জন্য ছোটখাটো স্বার্থত্যাগ আমাদের করা দরকার। সদা হাস্যমুখে থাকবেন আর মিষ্টি কথা বলবেন।

এই হাসিমুখ আর মিষ্টি কথা দ্বারা বহু লোককেই আপনি বন্ধুহিসেবে পাবেন। তার ওপর যদি ছোটখাটো স্বার্থত্যাগ করতে পারেন, তা হলে দেখবেন আপনার বন্ধুর আর শেষ নেই। বন্ধুকে ভালবাসুন, মনপ্রাণ দিয়ে তার ব্যথা যে কোথায় তা বোঝবার চেষ্টা করুন। নিজেকে সদাসর্বদা তার অবস্থায় রেখে, বন্ধুকে বিচার করুন। তা হলে দেখবেন, বিপদের দিনে বা প্রয়োজনের সময় আপনার আর বন্ধুর অভাব হবে না।

আপনি হয়তো প্রশ্ন করবেন—এত কষ্ট করে বন্ধু করবার কি প্রয়োজন ?

জানবেন—বন্ধুহীন জীবন বড় বিষময়। প্রাণখুলে কথা বললে আপনার শরীর মন তাজা হয়ে উঠবে। আজকের দিনে, যখন অর্থনৈতিক সমস্যা এত প্রবল আর তার সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিয়েছে মানুষের দ্রুত জীবন-যাত্রা তখন জীবন-সংগ্রামে একা নেমে আপনি খুব শীঘ্রই ক্লান্ত হয়ে পড়বেন। জানবেন—শ্রীকৃষ্ণের মত বন্ধু ছিলেন বলেই অত বড় কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে পাণ্ডবদের জয় সম্ভব হয়েছিল। নইলে সেনাপতি তো যুদ্ধে নেমে পালিয়ে যেতে

চেয়েছিলেন। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট সকলের সঙ্গে হাসিমুখে ব্যবহার করতেন। তাঁর বন্ধুত্ব থেকে দাস-দাসীও বাদ যেত না।

অমুক আমার চেয়ে বড়, অমুক আমার চেয়ে ছোট এ মনোভাব মনে আনবেন না। এত কথা বলছি তার কারণ, স্কুলে কলেজে বা অফিসেতে বহু বন্ধুত্ব বিবাহসূত্রে পরিণত হচ্ছে। সেখানে যখন এই ফাটল দেখা দেয়, তখন তা হয়ে ওঠে অত্যন্ত মর্মান্তিক। এই প্রসঙ্গে আমার এক রোগিণীর কথা না বলে পারি না। মেয়েটিকে দেখতে ছিল মাঝামাঝি। কিন্তু অফিসের কর্তার ছেলে ছিল অপূর্ব সুন্দর দেখতে।

প্রথমে বন্ধুত্ব। পরে তা রূপান্তরিত হল প্রেমে। শুধু তাই নয়। বাপ, মা, আত্মীয়-স্বজনের নিষেধ সত্ত্বেও ছেলেটি মেয়েটিকে বিয়ে করে।

ফলে যা হবার তাই হল। আত্মীয়-স্বজন থেকে তাদের দূরে সরে যেতে হল। মেয়েটির মনে প্রতিক্রিয়া দেখা দিল—সেই বুঝি ছেলেটির সর্ব দুঃখের কারণ। এই চিত্তবৈকল্য তাকে ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করে ফেললো। মেয়েটি হল অবসাদ-রোগগ্রস্ত। ফলে তার হিতাহিত জ্ঞান চলে যায়। তার নিজের অনুশোচনার প্রতিক্রিয়া আঘাতরূপে দেখা দিল ছেলেটির ওপর। সংসারে শান্তি না পেয়ে ছেলেটি ধরলো মদ। ফল যা ফলবার তা ফললো। সমাজে চালু হয়েও ছেলেটি হল মাতাল আর মেয়েটিকে যেতে হল এক মানসিক হাসপাতালে। সংসার তাদের গেল ভেঙে।

আর একটা কাহিনী বলে আমার এই প্রবন্ধ শেষ করবো। সব সময় জানবেন খুব শীঘ্র বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে না, এতে লাগে

প্রচুর সময়। কারণ পরস্পরের মন বুঝতে গেলে সময় তো লাগবেই।

দুটি ছেলেমেয়ে, তারা একই সঙ্গে একই কলেজে পড়তো। প্রথম দর্শনের পর স্বাভাবিক যৌন আকর্ষণে তারা হল আকৃষ্ট। দৈহিক আকর্ষণকে প্রেম মনে করে তারা পরস্পরকে করলো বিয়ে। এই বিয়ের পরিণাম যা হবার তা হল। একটি সন্তানের পরেই তাদের দৈহিক আকর্ষণ কেটে যেতে দু'জনের মধ্যেই দেখা দিল বিরক্তি। তখন কেউ কাউকে সহ্য করতে পারে না। দু'জনেই দু'জনকে মনে করে প্রবঞ্চক। আর সে রকম প্রবঞ্চক মনে করবার অর্থ যা হবার তাই হল। সংসার গেল চুলোয়। ছেলেটিকে স্থান নিতে হল বোর্ডিংএ।

তাই বলছি বন্ধু নির্বাচন করবার সময়ও সাবধান হবেন। আর নির্বাচনের পর তাকে বিশ্বাস, সহিষ্ণুতা, ধৈর্য, ভালবাসা দিয়ে অটুট রাখবেন। যদি কোন কারণে আপনাদের বন্ধুত্বের মধ্যে ফাটল ধরে তখন বন্ধুর সদগুণগুলি চিন্তা করবার চেষ্টা করবেন। এই সদগুণগুলি অনবরত চিন্তা করলেই দেখবেন আপনার মনে তার ওপর আর রাগ নেই। তখন শ্মশানে, বিচারালয়ে, আনন্দে, দুঃখে সব সময় আপনি বন্ধুর স্নেহস্পর্শ পেয়ে ধন্য হবেন। শুধু তাই নয়, আপনার মনের শক্তিও অনেক বেড়ে যাবে সাহায্যকারীকে পেয়ে।

সুখ কোথায় ?

বলতে পারেন—আমরা কি চাই ?

বেশী দিনের কথা নয়, আমার একটি রোগিণী আমার কাছে সেদিন এসেছিল। অনেক অভাব-অভিযোগের কথাই বলেছিল। অথচ আমি জানতাম, তার জীবনে কোন কিছুরই অভাব নেই।

তাই তাকে প্রশ্ন করি—বলতে পার, তুমি কি চাও ?

—হ্যাঁ,—বলেই মেয়েটি বলে—আমার চাই কানের দুটো খুব বেশী দামের হীরের ফুল।

আমি তাকে বলি—এইটা পেলেই তুমি সুখী হও ? তবে এইটুকু বল,—জীবনে আর কোন চাহিদা কি তোমার থাকবে না ?

মেয়েটি একটু ভেবে নিয়ে বলে—না, ডাক্তারবাবু, গহনা পেলে বোধহয় আমি সুখী হতে পারব না। প্রায় তিরিশ চল্লিশ হাজার টাকার গহনাই আমার তো আলমারিতে রয়েছে। তা হলে, বোধ হয় হীরের ফুল পেলেও আমি সুখী হতে পারব না।

আমি বলি—তবে কি পেলে আমি সুখী হতে পার ?

মেয়েটি বলে—আমার স্বামী যদি আমাকে নিয়ে আলাদা সংসার করে, যেখানে কেবল আমি আর ও থাকব, সেখানে হয়তো আমি সুখ পেতে পারি।

আমি বলি—ঠিক তো, তা হলে তোমার স্বামীকে সে কথা বলি ?

মেয়েটি একটু ভেবে নিয়ে বলে—না ডাক্তারবাবু, তাতেও

বোধ হয় হবে না। একার সংসার হলেই আমাকে আবার খুব ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠতে হবে, সংসারের ব্যবস্থা করতে হবে। ঠাকুর না এলে নিজে হাতে রাঁধতে হবে। এই তো সেদিন উনি আমাকে নিয়ে বাইরে গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে প্রথম ক'দিন বেশ শান্তি ছিল। তারপর মহা অশান্তিতে কেটেছে। ওঁর আর কি, বাজার করে দিয়েই খালাস! তারপরে কি বাঁধতে হবে, কেমন করে তা হবে সব ব্যবস্থা কর তুমি। আমি ও সমস্ত পারব না।

আমি বলি—পারবে না? পারবে না যখন তখন ওতে তুমি শান্তিও পাবে না।

মেয়েটি কাঁদো কাঁদো স্বরে আমাকে বলে—আপনি আমায় বলে দিন ডাক্তারবাবু কি পেলে আমি সুখী হই।

আমি বলি—তুমি আরও ভেবে দেখ। সব দিক দিয়ে বিচার করে বল।

পরে আর একদিন মেয়েটি এসে আমাকে বলে—ডাক্তারবাবু, এতদিন ধরে আমায় দেখছেন, আপনি ভাল করে জানেন, আমি কি চাই। আপনি বলুন কিসে আমার শান্তি!

আমি জানতাম মেয়েটিকে আমি যা বলব তাইতেই সে খুশী হতে পারবে না। কারণ ছেলেবয়েস থেকে সুখ বা শান্তি জিনিসটা যে কি তা সে কোন দিনই চিন্তা করেনি, কোন দিন ভাবেওনি। সর্বদা মনে করেছে, নিজের ইচ্ছাপূরণেই সুখ আর শান্তি। আর জানে না যে ইচ্ছা সব সময়ে পূর্ণ হয় না। তা ছাড়া কোন দিনই সে ভাবেনি বাইরের থেকে আমরা যা পাই তা ক্ষণস্থায়ী। নিজের মনের মধ্যে সুখ না থাকলে জগতে কোথাও গিয়ে সুখ বা শান্তি পাওয়া যায় না।

বিখ্যাত ঔপন্যাসিক থ্যাকারে একজায়গায় বলেছেন—"The world is a looking-glass, and gives back to every man the reflection of his own face" অর্থাৎ এ জগৎ একটা আয়না বিশেষ, এবং প্রত্যেক মানুষ যা দেখে সে তার নিজেরই ছায়া।

থ্যাকারের কথার অর্থ হল এই যে আমরা জগৎকে ঠিক তেমনিই দেখব যেমনটি আমরা দেখতে ইচ্ছা করব। যদি আমাদের মনের মধ্যে সুখ আর শান্তি থাকে তা হলে অবশ্যই জগৎও আমাদের কাছে সুখকর আর শান্তিপূর্ণ হয়ে উঠবে। আর যদি আমরা মনের মধ্যে অশান্তি আর দুঃখ পুষে রাখি তা হলে জগৎও আমাদের কাছে দুঃখকর, অশান্ত হয়ে উঠবে।

কথাটা বোধ হয় আরও পরিষ্কার হবে যদি আমারই এক রোগীর কথা বলি।

এই ভদ্রলোক ছেলেবয়সে অত্যন্ত অভাবের মধ্যে মানুষ হয়েছিলেন। তাই তিনি মনে করতেন অর্থই বুঝি জীবনে শান্তির একমাত্র উপায়!

পড়াশুনা করবার বেশি সুযোগ পাননি। সামান্য টাকা মূলধন নিয়ে তিনি পানের ব্যবসা করেন। তারপর তাঁর ভাগ্য আস্তে আস্তে সুপ্রসন্ন হতে থাকে।

মধ্যবয়সে তাঁর কিছুরই অভাব ছিল না। গাড়ি, কলকাতা শহরে বাড়ি, এককথায় মানুষ যা চায় তিনি তাই পেয়েছিলেন। কিন্তু ভদ্রলোকের দুর্ভাগ্য তাঁর স্ত্রী ছিলেন অত্যন্ত মুখরা।

সমস্ত দিন ক্লান্তির পর ভদ্রলোক যখন বাড়ি ফিরে আসতেন তখন মনের সবটুকু বিষ তিনি তাঁর স্বামীর ওপর বর্ষণ করতেন।

ভদ্রলোকের ক্লান্ত শরীর ও মনের ওপর এই বিষের ক্রিয়া দেখা দিতে দেরি হল না। ভদ্রলোক হলেন অবসাদ-রোগগ্রস্ত।

আমাকে তিনি বলেন—ডাক্তারবাবু, এই কি আমি চেয়েছিলাম? ছেলেবয়েস থেকে জানতাম অর্থই জীবনে সমস্ত সুখ আর শান্তি দিতে পারে। তাই প্রাণ দিয়ে অর্থ রোজগার করার চেষ্টা করেছিলাম। রোজগার করেওছিলাম। কিন্তু শান্তি তো আমি পেলাম না। ছেলেটাও মানুষ হল না, স্ত্রীও ওরকম হল।

আমি তাঁকে যত বোঝাবার চেষ্টা করি, তিনি অঝোরঝরে ততই কাঁদতে থাকেন।

এর থেকে আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারি অর্থের আর যা কিছু দেবার ক্ষমতা থাক না কেন প্রকৃত সুখ বা শান্তি দেবার ক্ষমতা নেই।

আর একটি মেয়ের ছিল যশ লাভের আকাঙ্ক্ষা। মেয়েটি ভাল গানও গাইতো। গান শুনে লোকে তাকে প্রশংসাও করতো। রেডিও, রেকর্ড, ফিল্ম—আস্তে আস্তে সর্বত্রই তার ডাক পড়তে লাগলো। অর্থাভাব আর রইলো না। এক ভদ্রলোক গান শুনে মেয়েটিকে বিবাহও করেন।

নানা ধরনের লোক আসতে থাকে মেয়েটির কাছে। অবশেষে মেয়েটি পা দিল আর এক প্রলোভনে।

একটি বড়লোক মেয়েটিকে বলে—আপনার বাইরে যা নাম তাতে এ সংসারে আপনাকে মানায় না। আপনি বরং···

এই "বরং"-এর অর্থ মেয়েটি বুঝলো আরও দু বছর পরে।

প্রথম প্রথম রঙীন আবহাওয়ায় বেশ কেটে গেল। তারপর নতুনত্বের মোহ কেটে যেতে তার মন ভেঙে পড়লো। সংসার

ত্যাগ, প্রলোভনের মধ্যে নিজেকে ছেড়ে দেওয়া, আরও যশ পাবার আশা—সবই ব্যর্থ হল। ধীরে ধীরে সে হয়ে পড়লো অপ্রকৃতিস্থ। কোথায় গেল গান, কোথায় গেল সম্মান! একটি মানসিক হাসপাতালে তাকে দেখেছি আপনমনে চুপচাপ বসে থাকতে। চোখের জলে বুকের কাপড় ভিজিয়ে মাঝে মাঝে সে গাইতো—

চলার পথে থেমে যাও
বৃন্দাবন পথ যাত্রী।

তার মনঃসমীক্ষা করতে গিয়ে, তাকে বহুবার বলতে শুনেছি—ডাক্তারবাবু, আমি নাম চেয়েছিলাম, যশ চেয়েছিলাম কিন্তু এ ধরনের জীবন তো আমি চাইনি! আমার জীবনে এ কি হল? তা ছাড়া, যশ পেয়েও আমি সুখী হলাম না কেন? কেন আমার স্বামীর ঘর আমি ছাড়তে গেলাম?

এ সকল প্রশ্নের জবাব কি দোব! মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে চেয়ে থাকি। আমি জানি যাদের আমরা অপ্রকৃতিস্থ বলি, সময় সময় তাদেরও প্রশ্নের জবাব দেবার ক্ষমতা আমারও থাকে না।

আর একটা কাহিনী বলি এই সম্পর্কে। আর এক ভদ্রমহিলা আমার কাছে এসেছিলেন চিকিৎসিত হতে। বয়স তাঁর কতই বা! সাতাশ বা আটাশ হবে। অপরূপ সুন্দর দেখতে। কিন্তু বিধবা। ছেলেবয়েসেই মেয়েটির সুন্দর রূপ দেখে তাঁর বাবা, মা, আত্মীয়স্বজন ভাবতেন মেয়েটির খুব ভাল ঘরে বিয়ে হবে।

বিয়ে হবে, বিয়ে হবে—কথাটা শুনতে শুনতে মেয়েটিও মনে একটি সংসার এবং দু-একটি ছেলের মা হবার কল্পনা করেছিলেন। কিন্তু ভাগ্যের এমনি নির্মম পরিহাস, পাঁচ-ছ মাস না যেতে যেতেই তাঁর স্বামী হঠাৎ একটা দুর্ঘটনায় মারা যান।

গোঁড়া হিন্দু ঘরের মেয়ে তাই পুনর্বার বিবাহের কেউ চেষ্টা করেননি। অথচ তাঁর ভেতরের আকাঙ্ক্ষা তাঁকে অহরহ দগ্ধ করতে লাগলো।

সাধারণ সংসারে যা হয় এ ক্ষেত্রেও তাই হল। মেয়েটির স্বামী মারা যেতে সকলের কাছ থেকেই হঠাৎ যেন তাঁর দাম কমে গেল।

নিজেকে অবাঞ্ছিত মনে করে আত্মীয়স্বজনের পরশ এড়িয়ে ভদ্রমহিলা জীবনযাত্রা শুরু করেন। কিন্তু আকাঙ্ক্ষার হাত থেকে রেহাই পাবেন কি করে? ধীরে ধীরে তিনি হলেন অপ্রকৃতিস্থ।

আমার কাছে নিয়ে আসবার পর আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম—তোমার কি হচ্ছে মা?

বুকফাটা কান্নায় ভেঙে পড়ে মেয়েটি বললেন—ডাক্তারবাবু, এ কি হল আমার! জীবন যে ব্যর্থ হয়ে গেল! এ তো আমি চাইনি।

যাক, সে সব অনেক কথা।

আমাদের প্রশ্ন হল—সংসারে বেঁচে থাকতে গেলে এসব তো আছেই, তবে এর হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় কি করে?

আমি বলব—জীবনের কোন ঘটনাতেই আপনি কখনও ভেঙে পড়বেন না। জানবেন ঘটনা ক্ষণস্থায়ী। একদিন-না-একদিন তা কেটে যাবেই। সুখ ও দুঃখকে সমানভাবে মেনে নেবেন। আর তা না করলেই আপনার জীবনে দেখা দেবে নানা ধরনের সমস্যা—যে সমস্যার আদি-অন্ত নেই।

এক্ষেত্রে, আমার আর একটি রোগিণীর কথা উল্লেখ না করে পারি না।

ভদ্রমহিলার বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। একমাত্র ছেলেকে অত্যন্ত কষ্ট করেই তিনি লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। ছেলেও মানুষ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ভদ্রমহিলার স্বামী খুব বেশী দিন বাঁচেননি। মানুষ হয়ে ছেলেটি ভাল রোজগারও করতে লাগলো। মাকে সুখে রাখবার জন্যে তার ছিল আপ্রাণ চেষ্টা। এমন সময় মা দিলেন ছেলের বিয়ে। বিয়ের পর হঠাৎ তিনি মনে করলেন তাঁর ছেলে আর তাঁর প্রতি তেমন মন দিচ্ছে না। তার সব মনটা গিয়ে পড়ছে স্ত্রীর ওপর। মনে মনে উঠলো ঈর্ষা। প্রকাশ হতেও দেরি হল না। বেধে গেল শাশুড়ী-বৌতে ঝগড়া। ছেলে পড়লো মাঝখানে। একদিকে মা অপরদিকে স্ত্রী।

মার মুখ চেয়ে সে সব সহ্য করবার চেষ্টা করলো। কিন্তু মা ভাবলেন ছেলে বুঝি বৌয়ের মুখ চেয়ে কোন কথাই বৌকে বলতে চায় না। ফলে অশান্তি না কমে দিন দিন তা বাড়তে লাগলো।

বিবাহিতা স্ত্রী, তাকে ফেলেও দেওয়া যায় না। সব বুঝে ছেলেটি রইলো চুপ করে। কিন্তু মার নারীর মন আর মানিয়ে নিতে পারলো না। আজ এটা নেই কাল সেটা নেই। ছেলের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগের আর শেষ নেই। তাঁর চরম আর শেষ অভিযোগ হল,—"আমাকে মা বলে দেখবার বুঝি আর কেউ নেই!"

আমার কাছে আসবার পর আমি তাঁকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করি। বলি—আপনার ছেলের বিয়ে দিয়েছেন। একটি দুটি নাতি-নাতনীও আপনার হয়েছে, এখন পুত্রবধূকে ফেলে দেওয়া কি সম্ভব? তা ছাড়া আপনার পুত্রবধূও মেয়ের মত। তার দোষত্রুটি আপনি একটু ক্ষমার চোখেই দেখুন।

কিন্তু ভদ্রমহিলার মুখে সেই একই কথা—ও আমার ছেলেকে পর করে দিয়েছে। ওরই জন্যে আমার ছেলে আমাকে আর মা বলে দেখে না।

তিনি বুঝলেন না, বোঝবার চেষ্টাও করলেন না, তিনি যদি একটু ভালবাসা দিয়ে পুত্রবধূকে আপন করে নেন, তা হলে সমস্ত পরিবারটা সুখের হয়ে ওঠে। শান্তি পেলে তাঁর ছেলে আরও উন্নতি করতে পারে, আর নাতি-নাতনীরাও ভালভাবে শিক্ষা পেতে পারে।

কিন্তু তাঁর না-বোঝার ফলে ছেলেটিরও স্বাস্থ্য ভেঙে গেল, পুত্রবধূরও মনের শান্তি নষ্ট হল, আর নাতি-নাতনীরাও ভাল শিক্ষা পেল না। অবশেষে একদিন সেই ভদ্রমহিলাকে আশ্রয় নিতে হল একটি মানসিক হাসপাতালে। আর মুখে না বললেও ছেলেটি মনে মনে স্ত্রীকে দায়ী করতে লাগলো তার মার এই অবস্থার জন্যে।

এ ধরনের ঘটনা সংসারে আমরা নিত্যই দেখতে পাই। অনেকেই হয়তো গোপনে চোখের জল ফেলেন। বাইরে মানসিক বিকারের লক্ষণ দেখা যায় না বলে আমরা জানতেও পারি না তাঁদের কথা। কিন্তু তা যখন ঘনীভূত আকারে প্রকাশ হয়, তখন তা সারানো অত্যন্ত কঠিন।

তাই বলছি,—গোড়াতেই যদি এর মূল উৎপাটন করা যায় তা হলে অনেক সংসারই হয়ে উঠবে সুখের। জগতের সব ঘটনাকেই আমরা যদি মেনে নিই, এবং মেনে নিয়ে হতাশ হয়ে না পড়ে তার মধ্যে আমরা কতখানি কি করতে পারি এই চিন্তা যদি করি, তা হলে হয়তো আমরা অনেক সুখী হতে পারব। যেমন দেখা গিয়েছিল 'বীথোভেনে'র জীবনে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ

পিয়ানো বাদককে আমরা হয়তো কোনও দিনই দেখতে পেতাম না যদি তিনি অন্ধ হয়ে দুঃখে ভেঙে পড়তেন। প্রত্যেক ডাক্তার তাঁকে বলেছিলেন তাঁর দৃষ্টিশক্তি আর ফিরবে না। হতাশায় ভেঙে না পড়ে চেয়ারটা টেনে নিয়ে তিনি বসলেন পিয়ানোর সামনে। তারপর পিয়ানোর সাহায্যে তিনি বার করে গেলেন এমন সব সুর যা আজও সমাদৃত হচ্ছে সারা দুনিয়ায়। ডাঃ মিস্ হেলেন কেলারের কথাও আজ আর কারুর অজানা নেই। অন্ধ, কালা, বোবা হয়েও তিনি আজ আমেরিকার একজন সর্বজন-সমাদৃতা মহিলা।

তাই বলছিলাম সুখ আর দুঃখ তো আছেই, তা বলে হতাশায় ভেঙে পড়লে চলবে না।

এ প্রসঙ্গে আর একটি কাহিনী বলি যে কাহিনীতে আমরা দেখতে পাব সামান্য হতাশার জন্যে কেমন করে একটা সংসার ভেঙে পড়লো।

এক ভদ্রলোক বিয়ে করেছিল এক শিক্ষয়িত্রীকে। স্বামী-স্ত্রীর যৌথ আয়। সংসারে অভাব-অনটন কিছুই ছিল না। দুজনকে দুজন দেখেছে অনেক দিন ধরে, মনও জেনেছে তার সঙ্গে।

কিন্তু একটা জিনিস তারা জানতে পারেনি, সেটা হল তাদের পরস্পারের স্বভাব।

ছেলেবয়েস থেকেই মেয়েটি শিক্ষয়িত্রী হবে বলে নিজেকে তৈরি করেছে। এম. এ., বি. টি. পাস করার পর একটি স্কুলের কাজ নিয়ে মেয়েটি সুখেই ছিল। অপর দিকে ছেলেটির ছিল শিল্পী মন। মাসিক পত্রিকায় গল্প, কবিতা সে লিখতো। দুচারখানা উপন্যাস লিখে লোকের কাছ থেকে সে প্রচুর বাহবাও পেয়েছে।

মেয়েটি রুটিনমত স্কুলে যায়, রুটিনমত ছাত্রী পড়ায়, রুটিনমত খায়, শোয়, সপ্তাহান্তে সিনেমা দেখে। জীবনটা রুটিনে বদ্ধ তার কাছে। বে-রুটিন হওয়া সে পছন্দ করে না, ভালওবাসে না।

অপর দিকে ছেলেটি কোন নিয়মে নিজেকে বাঁধতে চায় না। ঠিক সময় স্ত্রী খেতে ডাকতে এলে সে "যাচ্ছি" বলে নিজের লেখার মধ্যে ডুবে যায়। ঘণ্টা দু'একের মধ্যে আর খাবার সময় হয় না।

স্ত্রী কোন দিন চায় স্বামী তার কাছে থেকে তাকে ভাল-বাসুক, সোহাগ করুক, কিন্তু করবেটা কে? ছেলেটি হয়তো তখন খাওয়াদাওয়ার পর আবার লেখায় মশগুল হয়ে গেছে। স্ত্রী ভাবে, আমি বিয়ের আগেও যেমন একা ছিলাম আজও তেমনি একা। তা হলে আমার বিয়ে করার প্রয়োজন!

অপর দিকে বারবার খাওয়া, শোয়া, ওঠা, বসায় তাগাদা পেয়ে ছেলেটি ভাবে সাধ করে এ কি শৃঙ্খল আমি গলায় পরলাম! এ শৃঙ্খল না ভেঙে ফেললে এ আমার একদিন কণ্ঠরোধ করবে।

প্রথম শুরু হল খুঁটিনাটি নিয়ে ঝগড়া। মান-অভিমানের পালা। কেউই বুঝতে পারে না তার দোষ কোথায়। ফলে এমন এক দিন এলো যে দিন তাদের পরস্পরকে আলাদা হতে হল। মেয়েটি দুঃখে আর লজ্জায় পুরোন চাকরি ছেড়ে দিয়ে গেল কলকাতার বাইরে। দুঃখে আর অভিমানে ছেলেটি দিল লেখা ছেড়ে।

কিন্তু এর কি প্রয়োজন ছিল? একটুখানি মানিয়ে নেবার শক্তি, এতটুকু স্বার্থত্যাগ দুজনকেই বাঁচাতে পারতো তাদের জীবনের এতবড় দুঃখ থেকে। তাই বলছি—ঘটনায় বিচলিত না

হয়ে, সুখ আর দুঃখকে মনে করবেন আপনার ডান আর বাম হাত। সাহসী সৈনিকের মতনই সংসারে এগিয়ে যাবেন। সব কিছুর সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার চেষ্টা করবেন। দুঃখ আর হতাশাকে বড় করে দেখবেন না। মনে যখনই হতাশা আসবে তখনই জীবনে সুখের দিনের কথা চিন্তা করবেন। আর স্বার্থত্যাগ করতে গিয়ে যদি কষ্ট হয় তখন ভাববেন, তাতে সংসারে লাভবান হবেন আপনি সব চাইতে বেশী। জানবেন স্বার্থত্যাগ কখনও ব্যর্থ হয় না। শুধু তাই নয়, নিজে সুখী হবার চেষ্টা না করে, অপরের সুখে সুখী হবার এবং অপরকে সুখী করবার সদাসর্বদা চেষ্টা করবেন, তা হলেই দেখবেন আপনিও নিজে সুখী হয়েছেন। অপরের সুখ দেখলে আপনার মন প্রফুল্ল হবে, আর সেই সঙ্গে আপনার মনের সমস্ত গ্লানি দূর হয়ে যাবে।

গোড়া কেটে আগায় জল

শিশুদের মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে লিখতে বসে প্রথমেই আমার মনে হচ্ছে আমাদের চলতি কথায় একটা প্রবাদবাক্য আছে, সেটা হচ্ছে—"গোড়া কেটে আগায় জল দেওয়া"।

কথাটা বিদ্রূপাত্মক হলেও, এর মধ্যে সার আছে বলে আমার মনে হয়।

ধরুন, প্রত্যেক বাপ-মা-ই চান তাঁদের ছেলেমেয়েরা সমাজের একজন মধ্যমণি হোক। প্রচুর টাকা রোজগার করুক, খ্যাতির চরম সীমায় উন্নীত হোক।

কিন্তু উন্নত তারা হবে কি করে! যেমন, চারা গাছকে মাটির বুক থেকে উপড়ে ফেলে যতই সার আর জল দিন, সে গাছ আর বাড়ে না, ধীরে ধীরে শুকিয়ে যায়, এক্ষেত্রেও ঠিক তাই।

খুব শিশুকাল থেকে সন্তানের মনস্তত্ত্বের দিকে যত্ন না নেওয়ার ফলে, বা অতিযত্নের ফলে, সে ছেলেও আর ভবিষ্যতে শত চেষ্টা করার ফলেও মানুষ হয়ে উঠতে পারে না।

যেমন, একটি বাচ্চা ছেলে জন্মেছিল সহজাত সংগীত-প্রতিভা নিয়ে।

ছেলেবয়সে অর্থাৎ দু'তিন বছর বয়সেই সে গান শুনতে ভালবাসতো।

শুধু তাই নয়, কচি গলায় তা গাইতোও। কিন্তু গান-বাজনার দিকে ঝোঁক গেলে ভবিষ্যতে পাছে ছেলে নষ্ট হয়ে যায়, একরকম এই জন্যেই তার মা চালালেন তার ওপর কড়া শাসন। ছেলেকে গুনগুন করতে দেখলে তিনি দিতেন উত্তম-মধ্যম।

ফলে ছেলেটি মাকে ভয় করতে শিখলো। শুধু ভয় নয়, ভবিষ্যৎ জীবনে দেখেছি তার বহু জিনিসের সৌন্দর্যবোধ নষ্ট হয়ে গেছে, মার খাওয়ার ফলে মনের প্রসারতাও হয়নি। কুড়ি বছর বয়সেও ছেলেটি রয়ে গেল একটি পাঁচ ছ বছরের ছেলের মন নিয়ে।

শত চেষ্টা করা সত্ত্বেও তার মন আর বাড়লো না। কারণ দেহ বাড়তে পারে খাবার আর জল পেয়ে, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে মন বাড়াতে গেলে চাই পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া। সেই না-বাড়তে-পারা মনই তার ভবিষ্যৎ জীবনে হলো মানসিক ব্যাধির কারণ।

তাই বলছিলাম, মা হয়ে সেই ভদ্রমহিলা ছেলের যে কি ক্ষতি করে গেলেন তা তিনি কোন দিনই জানতে পারলেন না।

শাস্তি দেওয়ার আর একটা কুফল আছে। এমন সংসারও দেখেছি যেখানে বাপ মনে করেন ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কথা বলা বা তাদের সঙ্গে মেশা তাঁর সম্মানের দিক থেকে ক্ষতিকারক।

কিন্তু তিনি কি জানেন, যেমন একটা বড় গাছের আশ্রয়ে ছোট গাছ বেড়ে ওঠে, ঠিক তেমনি তাঁকে আশ্রয় করে তাঁর ছেলেমেয়েরা বেড়ে উঠবে ?

ছেলেবয়সে যদি ছেলেমেয়েরা বাপ মার সঙ্গ না পায় বা তাঁদের বিশ্বাসের পাত্র না হয়, তা হলে ভবিষ্যৎ জীবনে তারাও কোন লোককেই আর বিশ্বাস করতেও পারে না বা তাদের মনের পুষ্টিসাধনও হয় না।

এক্ষেত্রে আমার একটি রুগীর কথা বলবো।

রুগীটি ছেলেবয়সে বাপের সঙ্গ পায়নি, মাকেও ভালবাসতে পারেনি। কড়া শাসনের জন্য ছেলেবয়স থেকেই সে ভয়ের মধ্যে মানুষ হয়েছিল। ফলে ভবিষ্যতে সে কাউকে আপনার

বলে ভাবতে পারলো না। তার আত্মবিশ্বাসও জন্মালো না, ফলে কোন কাজেই সে মন দিতে পারলো না। দেখা দিল—অবসাদ। এই অবসাদের ফলে, নিজের স্ত্রী, পুত্র থাকা সত্ত্বেও ছেলেটি হলো একা। সে যে কি দুর্বিষহ জীবন তা লেখার মাধ্যমে প্রকাশ করা যায় না। দিনরাত কেবল আত্মহত্যার চিন্তা। কোন লোকের মিষ্টি কথাও তাকে সান্ত্বনা দিতে পারতো না।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা বলি। ইংরেজীতে একটা কথা আছে—"Spare the rod and spoil the child."—অর্থাৎ যদি তোমার বেত তুমি সংযত কর, তা হলে তুমি তোমার শিশুকে নষ্টই করবে। ফলে, অনেক বাপ-মা-ই বাড়িতে একেবারে মিলিটারীদের মত নিয়মকানুন মেনে চলেন।

এই শাস্তি থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য ধীরে ধীরে ছেলেরা মিথ্যা কথা বলতে শেখে।

প্রত্যেক শিশুই প্রথমবার যখন মিথ্যা কথা বলে, শাস্তির হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করবার জন্যই বলে।

এই সহজ উপায়ে, অব্যাহতি পাওয়ার পর, সে সেটাকেই আশ্রয় করে নেয় তার নিজের চরিত্রের মধ্যে। ফলে, ভবিষ্যতে অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে মিথ্যা কথা বলে।

এখন এই মিথ্যা কথা বলার হাত থেকে ছেলেদের রক্ষা করা যায় কি উপায়ে ?

যখনই কোন বাপ-মা লক্ষ্য করবেন তাঁদের ছেলে দোষ করেছে, তখন তাকে শাস্তি দেবার পরিবর্তে স্নেহ দিয়ে বুঝিয়ে দিতে হবে তার অন্যায়টা কোথায়।

যদি শিশু তার অন্যায় বুঝতে না পারে তা হলে কোন দিনই নিজেকে সংশোধন করতে পারবে না। আর অন্যায়ের পরিবর্তে

যদি সে লাঞ্ছনা আর তিরস্কার পায় তা হলে সে সেটাকেই ভয় করবে, অন্যায়কে নয়।

এখন প্রশ্ন হতে পারে—কী উপায়ে শিশুকে বুঝানো যায়!

এক্ষেত্রে আমি মহাত্মা গান্ধীর আত্মজীবনী পড়ে দেখতে অনুরোধ করি।

ছেলেবয়সে তিনি একদিন শিশুসুলভ চপলতায় চুরিও করেছিলেন। বাবা জানতে পারলে তাঁর দারুণ শাস্তি হবে, একথা তিনি মনেও ভেবেছিলেন।

ক্রমশঃ বাবা জানতে পারলেন। একটা দারুণ শাস্তি তিনি আশঙ্কা করেছিলেন। পরিবর্তে তিনি দেখলেন বাপের চোখে জল। ঢের বেশী কাজ হলো তাতে। তিনি বুঝলেন, যে অন্যায় তিনি করেছেন তা আঘাত এনেছে বাপের মনে। সত্যিকারের মহাত্মা গান্ধীর জন্ম বোধ হয় সেইদিনই হয়েছিল।

তাই বলছি, মারধোর করে শিশুর চরিত্র বদলানোর চেষ্টা করা বাতুলতারই নামান্তর। তাতে ফল তো ভাল হয়ই না, উপরন্তু খারাপই হয়।

বকুনি আর শাস্তিতে যেমন শিশুর চরিত্রগঠন হয় না তেমনি অতি যত্নের ফলে আবার তারা বাড়েও না।

যেমন অতি স্নেহের বশে ছেলেমেয়েকে কোন কাজ বাপ-মা নিজের হাতে করতে দেন না। যদি কোন কারণে তার কোন প্রয়োজনীয় জিনিস পেতে দেরি হল, সেজন্য ছেলেমেয়েকে নিজে হাতে করে নিতে না দিয়ে লোকজনকেই বকতে শেখালেন। কিংবা তাদেরই সামনে নিজেরাই লোকজনকে বকে দিলেন।

ফলে হলো কি! ছেলে আত্মনির্ভরশীল হলো না। বয়স

বাড়লে দেখা গেল সে হয়েছে একটি অতি শিশু। কোন ব্যাপারেই সে বেশীক্ষণ মনোযোগ দিতে পারে না। যখনই যা তার মনে হয়, তখনই তার সেটা চাই।

এক্ষেত্রে আমার একটি রুগিণীর দৃষ্টান্ত দিলে ব্যাপারটা হয়তো পরিষ্কার হবে।

এক মহিলা এলেন আমার কাছে চিকিৎসিত হতে। বয়েস বত্রিশ, তেত্রিশ হবে। দু'সন্তানের জননী তিনি। তাঁর স্বামীর মুখ থেকে শুনলাম ভদ্রমহিলা নাকি বরাবরই একটু অভিমানিনী। কিন্তু সম্প্রতি তিনি সকলকার সঙ্গেই ভীষণ রাগারাগি করছেন, কোনও ব্যবহারই তাঁর প্রকৃতিস্থ নয়।

পরীক্ষা করে বুঝলাম ভদ্রমহিলা উত্তেজনায় ভুগছেন। এমন কেন হলেন, কোন কারণই প্রথমটা বুঝতে পারি না। দু-চারদিন মনঃসমীক্ষার পর বুঝলাম ভদ্রমহিলা ছিলেন বড়লোকের মেয়ে। তাঁর কোন ব্যাপারে ত্রুটি হলে, বাপ-মা অকথ্য ভাষায় লোকজনকে বকাবকি করতেন। ফলে তাঁর মনে ছেলেবয়েস থেকেই একটা দৃঢ় ধারণা হয়ে গিয়েছিল, তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করতে বুঝি সকলেই বাধ্য।

যতদিন তিনি বাপের বাড়ি ছিলেন ততদিন একরকম কেটে গিয়েছিল। তারপর বিয়ে এবং তাতেই তিনি পেলেন নতুনত্বের আনন্দ। কিন্তু তাঁর অবচেতন মন স্বামীকে স্বামী বলে মেনে নিল না, ভাবলো আর একটি নতুন, তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করার, চাকর। দৈহিক আনন্দ মিটে যেতেই অভিমানরূপে তা দেখা দিতে শুরুও করলো। তারপরে নিজের সন্তানদের দেখে তাঁর আবার নতুন করে শিশু হবার ইচ্ছা হলো। তাই তাঁর ব্যবহারে দেখা গেল অসংগতি, ইচ্ছা পূর্ণ করার ঘোর তাগিদ।

সাধারণ উপায়ে স্ত্রীকে বুঝাতে চেষ্টা করেন ভদ্রলোক—এটা করতে নেই, সেটা করতে নেই। অথচ স্ত্রী বুঝতেই পারেন না কেন তা করতে নেই এবং তাঁর স্বামীর তা তাঁকে বলবার কি অধিকার আছে। তাতেই সংঘর্ষ বাধে। এবং ভদ্রমহিলা হয়ে উঠলেন ক্রমশঃ উত্তেজিত। এই উত্তেজনা ক্রমশঃ এতই বাড়তে লাগলো যে শেষে মহিলাকে আশ্রয় নিতে হলো একটি মানসিক হাসপাতালে। শুনেছি, এই হাসপাতালে দেওয়ার দরুন তাঁর শ্বশুর আর শাশুড়ী ভদ্রলোককে প্রকাশ্যে অত্যন্ত অপমান করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা বুঝলেন না, জানলেন না, ঠিকমত মানুষ না করতে পারার ফলেই তাঁদের মেয়ে আজ সংসার করতে পারলো না। এতে ভদ্রলোকের দোষ কোথায় ?

আর একটা কথা এই ক্ষেত্রে বলি।

অনেক সময় দেখেছি, নিজের সাধ্যের অতিরিক্ত খরচ করে উপরওয়ালাদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিজের ছেলেমেয়েকে মানুষ করার একটা প্রবল বাসনা বাপ-মা'র থাকে। এই ইচ্ছা হয় তার কারণ, তাঁরা মনে করেন ব্যয়বহুল স্কুলে পড়ালে বুঝি তাঁদের ছেলেমেয়ে ভবিষ্যতে একটা কেউকেটা হতে পারবে। কিন্তু অধিকাংশ সময় দেখা যায় নতুন পরিস্থিতিতে গিয়ে নিজেদের অবস্থার কথা ভুলে গিয়ে ছেলেমেয়েরা মন দেয় বন্ধুবান্ধবের গাড়ি আর জামাকাপড়ের ওপর।

ক্রমশঃই তার চাহিদা বাড়তে থাকে। বাপ-মা তা যোগাতে পারেন না। ফলে সে মনে মনে তার বাপ-মাকে অশ্রদ্ধা করতে শেখে। এই অশ্রদ্ধার ফল যে কত ভয়ানক হতে পারে তার কথা বলি আমার একটি রুগীর কথা দিয়ে।

একবার এক ভদ্রলোক এলেন তাঁর তের চোদ্দ বছরের

ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে। কলকাতার একটি নামজাদা স্কুলের ছাত্র সে। সুন্দর ইংরেজীতে কথা বলতে পারে। কিন্তু ইতিমধ্যেই সে তার বাবার পকেট মেরেছে তিন চার বার।

স্কুলে বন্ধুবান্ধবদের জিনিস চুরি করে সে স্কুল থেকে হয়েছে বহিষ্কৃত।

প্রথমটা কোন কারণ বুঝতে পারি না। পরে বুঝতে পারি বড়লোক বন্ধুবান্ধবদের দামী জিনিসপত্র আর নানা ধরনের প্রলোভনের সামগ্রী দেখে ছেলেটির মনেও তীব্র বাসনা জাগে সেই সব সামগ্রী ভোগ করবার। বাপ-মাকে প্রথম সে অনুরোধ করে, কিন্তু তাঁরা স্বল্প আয়ের মধ্যে তা মেটাবেন কোথা থেকে। ফলে ছেলেটির মনে জাগে বাপ-মার প্রতি অশ্রদ্ধা। তখন সে নিজেই পথ খুঁজতে আরম্ভ করে তার ইচ্ছা পূর্ণ করার। তার ফলে হয় চৌর্যবৃত্তি।

মারধোরে এ অভ্যাস কমানো যায় না। এ অভ্যাস কমাতে গেলে শিশুকে আগে বুঝিয়ে দিতে হবে এর দোষ। পরে যে কারণে সে এমন গর্হিত কাজ করেছে, সেই কারণটিকে সমূলে উৎপাটিত করতে হবে। শিকড় মাটির তলায় গেঁথে গেলে যেমন তা উৎপাটন করা শক্ত হয়, তেমনি শিশুবয়সে এরকম দোষ দেখে, বড় হলে বুঝতে পারলে শুধরে যাবে, এ বিশ্বাস করাও তেমনি ভুল। কারণ তখন বিষবৃক্ষ উৎপাটন করার আর কোন সুযোগই থাকবে না।

এক্ষেত্রে আর একটা কথা বলি।

আমার আর একটি রুগী এসেছিল ষোল সতেরো বছর বয়সের। দিব্যি সুন্দর ছেলে। গত বছর তার স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দেবার কথা ছিল। টেস্ট পরীক্ষা দেবার পর ছেলেটির

হঠাৎ মনে হলো, পরীক্ষা দেওয়া মিথ্যে, তার পক্ষে পাস করা একেবারেই অসম্ভব। "ফি"ও তাই জমা দেবে না। অথচ টেস্ট পরীক্ষায় সে ভাল নম্বরই পেয়েছে।

মনঃসমীক্ষায় জানতে পারি, ছেলেটির মা সদাসর্বদা নিজের ছেলের সঙ্গে অপর ছেলের তুলনা করতেন; এবং ছেলেকে বুঝাবার চেষ্টা করতেন—যদিও সে পাস করছে বটে, তবুও অন্য ছেলেদের তুলনায় তার কিছুই হচ্ছে না, এবং কোনদিনই সে কিছু করতে পারবে না। ছেলেটির মা ভাবতেন একথা বললে বুঝি তাঁর ছেলে দ্বিগুণ উৎসাহে লেখাপড়া করবে। কিন্তু ফল হলো তার উলটো।

'হবে না', 'হবে না' শুনতে শুনতে ছেলেটির আত্মবিশ্বাসও ধীরে ধীরে চলে গেল। সেও বিশ্বাস করলো, তার দ্বারা কিছুই হবে না। তাই বড় পরীক্ষার সম্মুখীন হতেই এলো তার ভয়, হলো পেছিয়ে যাবার ইচ্ছা।

আমি তাকে বোঝাই—হোক বা না হোক একবার পরীক্ষা দিয়েই দেখ না? সে বলে, পাস করতে যখন পারবই না তখন পরীক্ষা দিয়ে লাভ? আমার শত অনুরোধ ও বোঝানো সত্ত্বেও গত বছর তাকে আর পরীক্ষা দেওয়াতে পারলাম না। তা হলেই বুঝতে পারছেন—তুমি পারলে না, অমুকের চেয়ে তুমি বুদ্ধিতে ছোট—এই ধরনের কথাবার্তা বলা কতখানি ক্ষতিকারক! যে মা চেয়েছিলেন যে তাঁর ছেলে উন্নতি করুক, সেই মা-ই হলেন ছেলের উন্নতির বাধাস্বরূপ।

এইবারে বলি আর একটা কথা। ষোল সতেরো বছরের একটি মেয়ে একবার আমার কাছে আসে পরীক্ষিত হতে। ভদ্রবংশের মেয়ে, রূপও আছে যথেষ্ট। তার বাবার মুখে

শুনলাম, মেয়ে নাকি সুযোগ পেলেই যে কোন পুরুষের সঙ্গেই প্রেম করতে চায়। তার পাত্রাপাত্র ভেদ নেই। মনঃসমীক্ষা করে জানতে পেরেছিলাম যে, মেয়েটি সুন্দর দেখতে বলে তার সাত আট বছর বয়স থেকেই তাকে আর কোনও ছেলের সঙ্গে খেলতে দেওয়া হতো না। দশ এগারো বছর বয়স হতেই তার ছাদে ওঠা, জানালায় দাঁড়ানো, স্কুলে যাওয়া প্রভৃতি হলো বন্ধ। কারণে-অকারণে মা-বাবার কাছ থেকে তাকে শুনতে হতো—তুই প্রেম করছিস্! এমন কি, বাড়ির চাকরের সঙ্গে কথা বলাও তার হলো বারণ। প্রেম যে কি বস্তু, মেয়েটি তখন বুঝতো না। তবে মা-বাবার ব্যবহারে সে এইটুকু বুঝেছিল যে, প্রেম করতে হয় পুরুষের সঙ্গে। ফলে বারো তেরো বছর বয়সেই দুপুরবেলা মা'র বিশ্রামের সুযোগ নিয়ে তার প্রথম প্রেম শুরু হলো বাড়ির চাকরের সঙ্গেই। প্রথম আলিঙ্গন ও চুম্বনে সৃষ্টি হলো তার যৌন উত্তেজনার। মেয়ে বুঝলো—প্রেম করা কি জিনিস। লক্ষীন্দরের লৌহবাসর হলো ফুটো—মেয়ে খুঁজতে লাগলো পুরুষ। ব্যাপারটা জানাজানি হতেই বাপ-মা হলেন আরও কড়া—মেয়েকে শাস্তি দিয়ে বন্ধ করলেন ঘরের মধ্যে। প্রেম করার বদনাম আগেই সে তা না করেই পেয়েছে। তাই লাঞ্ছনা ও শাস্তিতে আর ভয় রইলো না। ঘরের জানালা খুলে সে পাশের বাড়ির ছেলেকে আকর্ষণ করলো তার রূপ দিয়ে। ফলে সে বুঝে নিল তার দেহের দাম। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—এমনধারা কর কেন? উত্তরে সে আমায় বলেছিল—ডাক্তারবাবু! ইস্কুলে যাই না, বন্ধুবান্ধবও নেই। শুধু মা-বাবার কাছে পড়াশোনা করা আর লেকচার শোনা ছাড়া আমার কি কাজ আছে, বলতে পারেন?

মেয়েটির বাবাকে তাই বলেছিলাম—শুধু শুধু এর ইস্কুল ছাড়ালেন কেন? বাপ একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলেন—ভেবেছিলাম, ইস্কুলের ডেঁপো মেয়েদের সঙ্গে মিশে মেয়ে আমার খারাপ হয়ে যাবে। কিন্তু মেয়ে তো আমার মুখ রাখলে না!

অনেকেরই ধারণা আছে সমবয়সী মেয়েদের সঙ্গে বেশী মেলামেশা করলে মেয়েদের আড্ডার দিকে মন যাবে, কিংবা তারা বখাটে হয়ে যাবে। ছেলেদের সম্বন্ধেও এরকম ধারণা অনেকের আছে। কিন্তু আসলে তা কোনদিনই হয় না। বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে না মিশলে ছেলেমেয়েদের মন বেড়ে ওঠে না বা হালকাও হয় না। ছেলেবয়সে বহু লোকের সঙ্গে মেশা অভ্যাস হলে তবে ভবিষ্যতে সে অনেকের সঙ্গে সামাজিক রীতিনীতি বজায় রেখে চলতে পারবে। সে সৎ-অসৎ বিচার করতে পারবে। তবেই সে ভবিষ্যতে প্রকৃত মানুষ হতে পারবে। এক্ষেত্রে আমার আর একটি রোগীর কথা বলি।

একটি বড়লোকের ছেলে সাঁইত্রিশ বছর বয়সে আমার কাছে এসেছিল চিকিৎসিত হতে। রোগ ছিল তার 'অবসাদ'। কারো সঙ্গে মিশতে ভাল লাগে না। সমীক্ষা করে জানতে পেরেছিলাম যে, ছেলেটির বাবা ছেলেটিকে বাইরের জগতের সঙ্গে একেবারেই মিশতে দেননি। বাড়ির মধ্যে একেবারে বন্দী করে রেখেছিলেন। ইচ্ছামত ছেলের বিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু মেয়েটি স্বামীর ঘরে এসেই স্বামীর কাছে আবদার শুরু করলো। কিন্তু তার আবদার পূর্ণ করবার মত ক্ষমতা ছেলেটির নেই। তাই নিজেকে বড়ই অসহায় বোধ হতে লাগলো তার। অপরদিকে ছেলেটির বাবাও গেলেন মারা বিপুল সম্পত্তি রেখে। ভালমন্দ কোনদিনই বিচার করতে সে শেখেনি। তাই নগদ টাকা নষ্ট

হতেও বেশী দেরি হলো না। তখন দেখা দিল দুশ্চিন্তা। অথচ ছেলেবয়স থেকে মেলামেশা থাকলে ছেলেটির কোনদিনই জীবনের লক্ষ্য স্থির করতে দেরি হতো না, আর টাকাগুলোও এভাবে নষ্ট হতো না।

এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, ওপরে যতগুলো বিষয়ে আলোচনা করা গেল, সেই সব বিষয়ে ঠিক ঠিক মেনে চললে সব ছেলে-মেয়েই কি কেষ্ট-বিষ্টু হয়ে উঠবে? উত্তরে আমি বলবো—না। কারণ সব মানুষেরই বুড়োআঙ্গুলের ছাপ আলাদা, চেহারার মধ্যেও কিছু-না-কিছু বৈচিত্র্যও আছে। তাই তাদের মানসিক প্রবৃত্তিগুলোও বিভিন্ন রকমেরই হবে। তবে এই পর্যন্ত বলা যায় যে, তাদের যোগ্যতা হিসাবে তারা বেড়ে উঠবে এবং ভবিষ্যতে মানসিক রোগের হাত থেকেও রেহাই পাবে।

সুনির্দিষ্ট চিন্তা

প্রতিদিন জলেতে কত বুদ্বুদ ওঠে। কেই বা তার হিসাব রাখে! তেমনই অসংখ্য চিন্তা উঠছে আমাদের মনসমুদ্রে। আমরা তা কখনও বুঝতে পারি, কখনও বা পারি না।

বিশ্বাস হলো না বুঝি আমার কথাটা? বিশ্বাস হবার কথাও নয়। রেগে গিয়ে হয়তো বলবেন—আপনি কেমন ধরনের ডাক্তার, আমাদের বলছেন, আমরা আমাদের মনের খবর রাখি না! উত্তরে আমি বলব—কি করি বলুন, দীর্ঘদিন ধরে আমি যে এই জিনিসই দেখে আসছি। একটা পরীক্ষা করুন। পরীক্ষা করলেই আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন আমার কথা সত্য কিনা।

ঘরের দরজা জানলা বন্ধ করে দিয়ে অন্ধকারে খাটে বা একটা বড় সোফার ওপর শুয়ে পড়ুন। শোবার সময় ভেবে নেবেন, পনর কি কুড়ি সেকেণ্ড, অন্ততঃপক্ষে দশ সেকেণ্ড, আপনি কোন চিন্তা করবেন না। দেখবেন এক সেকেণ্ড যাবে না, আপনার মন কোন একটা চিন্তার সূত্র ধরে চলতে শুরু করেছে। যেই বুঝতে পারলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাকে আবার থামিয়ে দিন। আবার দশ সেকেণ্ডের জন্য অপেক্ষা করতে থাকুন। আবার দেখবেন, নতুন আর একটা চিন্তার সূত্র ধরে আপনার মন ছুটে চলছে। এইবারে বলুন—আমার কথা সত্যি কি না! মনের মধ্যে নতুন নতুন চিন্তার আবির্ভাব হচ্ছে কি না!

আপনি হয়তো বিস্মিত হয়ে গিয়ে আমাকে প্রশ্ন করবেন—আচ্ছা, যে চিন্তা আমি করিনি, বা যে জিনিস আমি ভাবতেও

চাই না, তা আমার মনে এলো কোথা থেকে? বা এই সমস্ত অগণিত চিন্তা থাকে কোথায়? তার উত্তরে আমি কেবল বলব —আমাদের এই সমস্ত চিন্তা অবচেতন মনের মধ্যে লুকিয়ে থাকে। সুযোগ আর সুবিধে পেলেই তা ভেসে ওঠে সচেতন মনের ওপর। ঠিক যেন একটা কুমির। নদী বা পুকুরের ঘাট খালি হয়ে গেলেই ঘাটের ওপরে উঠে আসে মানুষের দৃষ্টির মধ্যে। জলের তলায় যখন সে লুকিয়ে থাকে তখন আমরা জানতেও পারি না তার অস্তিত্ব।

এই সমস্ত পরস্পরবিরোধী চিন্তা বা নানাধরনের চিন্তা আমাদের সর্বদা নানাদিকে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায় বলে আমরা যা হতে পারতাম তা হতে পারি না, বা আমাদের শক্তিরও অযথা অপচয় হয়। মনকে দেয় দুর্বল করে। তার শক্তিকে সম্পূর্ণ-রূপে কাজ করতে দেয় না। সেইজন্য যতখানি প্রতিভার প্রকাশ হওয়া উচিত তা হতে পারে না। এর হাত থেকে বাঁচতে গেলে আমাদের করতে হবে 'সুনির্দিষ্ট' চিন্তা এবং তাকে সফল করবার জন্য চাই প্রাণপণ শক্তি।

এখন আমাদের দেখতে হবে—সুনির্দিষ্ট চিন্তা কি এবং তার উপকারিতাই বা কি।

বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব এমন একটা চিন্তাকে ধরে কাজ করে যাওয়ার নামই 'সুনির্দিষ্ট চিন্তা'। এই উপকারিতার বিষয় বলতে গিয়ে প্রথমেই বলতে হয়, ঐ ধরনের চিন্তা আমাদের ভুল ধারণা এবং নানাপ্রকার বদখেয়াল বা ঝোঁকের হাত থেকে রক্ষা করে। 'ভুল ধারণা' থেকে অব্যাহতি পেলেই আমাদের জীবনের গতিও হয় দ্রুত এবং বিপদশূন্য। কারণ এই ভুল ধারণার বশীভূত হয়েই মানুষ ঘটিয়ে ফেলে এমন সমস্ত ঘটনা যা সে

অন্তরের সঙ্গে কোনও দিনই চায়নি, আর ফল ভোগ করে চলে সারাজীবন ধরে।

এ থেকে আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারি কোনও কিছু ঘটনার চেয়েও মনের সুস্থ সবল গঠনই একান্ত প্রয়োজনীয়। সুস্থ সবল মনই আমাদের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়, ঘটনাকে জয় করাতে শেখায়, বিপদের মাঝখানে ফেলে পাল-ছেঁড়া, হাল-ভাঙা নৌকার অবস্থা করে না। আমাদের মন যতখানি আমাদের বন্ধু আবার ততটা শত্রুও বুঝি আমাদের কেউ নেই। গীতায় দেখেছি, কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে সেনাপতি হয়েও, যুদ্ধের সময় অর্জুনের মনে এলো বিভ্রান্তি। বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে তিনি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যেতে চাইলেন।

মোহগ্রস্ত বলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে নানাধরনের উপদেশ দিলেন, যোগশিক্ষা দিলেন। এই যোগ আর কিছুই নয় কোনও একটা বিশেষ চিন্তা ধরে এগিয়ে যাওয়া। মনের মধ্যে অন্য চিন্তার স্থান না দেওয়া। আমরা যখন লক্ষ্যভ্রষ্ট হই তখনই আমাদের মনে ওঠে নানা বিক্ষিপ্তি। এবং ঐ সমস্ত বিক্ষিপ্ত চিন্তা আমাদের করে দেয় দুর্বল।

এখন এই সমস্ত বিক্ষিপ্ত চিন্তার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার উপায় কোনওরকম গঠনমূলক সুচিন্তা করা। যেমন ধরুন, যুদ্ধের বিষময় ফলের কথা অর্জুন বললেন শ্রীকৃষ্ণকে। তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে স্মরণ করিয়ে দিলেন, কি কারণে তাঁরা যুদ্ধ করতে এসেছেন।

এখন আপনি উত্তরে বলবেন—আপনার কাছাকাছি তো আর ভগবান্ নেই। কে আপনাকে কোন্‌টা ঠিক চিন্তা বলে দেবেন?

আমি বলব—তা বলে দেবে আপনার সাধারণ বিচারবুদ্ধি। যা 'ঠিক' তা বুঝতে সাধারণ বুদ্ধির বেশী আর কিছুরই প্রয়োজন হয় না।

তবে এ কথা ঠিক, অনেক সময় substitute চিন্তা আমাদের সাধারণ বুদ্ধিকেও আচ্ছন্ন করে এবং মনের মধ্যে এমন সব চিন্তার সৃষ্টি করে যা আমাদের এগিয়ে নিয়ে যায় ধ্বংসের মুখে।

এ ক্ষেত্রে আমার একটি রোগিণীর কথা বলব। রোগিণীটি ছিল ভীষণ রাগী। তার রাগের চোটে তার স্বামী এবং তার শ্বশুরবাড়ির সকলেই ত্রস্ত। রাগলে তার আর জ্ঞান থাকতো না! অনেক সময় সে অজ্ঞান হয়েও পড়তো। কেন এমন হয়! রাতে ঘুম চলে গেছে, দিনেও বিশ্রাম করতে পারে না, কেমন যেন একটা ছটফটে ভাব।

মনঃসমীক্ষা করতে করতে আমি জানতে পারি, মেয়েটি চৌদ্দ পনর বছর বয়সে যৌনরোগের বিষময় ফল সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পড়েছিল। জিনিসটা ভাল করে তখন সে হৃদয়ংগম করতে পারেনি। কিন্তু এইটুকু সে বুঝেছিল, যে কোন লোকের যে কোন সময়ে এই রোগ হতে পারে এবং এ রোগ হলে তার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া অত্যন্ত কষ্টকর।

এর পরে মেয়েটির বিয়ে হয়, এবং শুরু হয় তার যৌনজীবন। কিছুদিন পরে তার হঠাৎ মনে পড়ে যায় যে ছেলেবয়সে তার একজন চাকর ছিল, কোনও একটা বিশ্রী রোগের জন্য তার মা বাবা তাকে তাড়িয়ে দেন। তখন থেকেই তার ধারণা জন্মায় ঐ চাকরটির নিশ্চয় সিফিলিস বা গণোরিয়া-জাতীয় কোনও রোগ ছিল এবং সেই রোগ তার দেহে সংক্রামিত হয়েছে। কারণ ঐ

চাকরটি তাকে কোলে-পিঠে করতো। এই ভুল চিন্তা তার মনে হলো বদ্ধমূল, এবং ধীরে ধীরে তাকে নিয়ে যেতে লাগলো ধ্বংসের মুখে। চিন্তার মধ্যে বিকৃতি এলো, আর তারই ফলে নিজের সুস্থ স্বামীকেও যৌনরোগে আক্রান্ত বলে সে সন্দেহ করলো।

এ থেকে রক্ষা পাবার উপায় ?

আমার এক ডাক্তার বন্ধুকে দিয়ে তার রক্ত পরীক্ষা করালাম। বিশ্বাস করাবার চেষ্টা করলাম তার দেহে ঐ ধরনের কোন রোগ আশ্রয় করেনি।

মেয়েটি হেসে জবাব দিল—ও তো আপনার বন্ধুর কাছ থেকে করিয়েছেন। তিনি তো আপনার মতে মত দেবেনই।

আমি বলি—কলকাতায় অনেক ডাক্তার আছেন, যাঁকে দিয়ে খুশি তুমি তোমার রক্ত পরীক্ষা করিয়ে দেখতে পার, রক্তে কোন বিষ নেই।

মেয়েটি আরও তিন জনের কাছে নিজের ও স্বামীব রক্ত পরীক্ষা করিয়েছিল। পরে সব রিপোর্টগুলো আমার কাছে একদিন এনে বললো—ডাক্তারবাবু, রোগ আমার দেহে নেই বটে, কিন্তু রোগ ধরেছে আমার মনে। যতদিন বিশ্বাস করতাম আমি রোগাক্রান্তা ততদিন আমি এদের ওপর অত্যাচার করতাম। আমি এখন লজ্জায় এদের মুখের দিকে চাইতে পারি না। এর চেয়ে যদি আমার মৃত্যু হতো!

মেয়েটি কাঁদতে লাগলো। সান্ত্বনার কোন কথাই সে শুনলো না। মেয়েটির স্বামীর মুখে শুনি, আগেকার মতনই অবস্থা। রাতে ঘুম নেই, সদা অস্থির ভাব।

একদিন আমি গিয়ে বললাম—এক রোগের হাত থেকে তুমি রেহাই পেয়েছ বটে, অন্য আর একটা রোগ তোমায় কিন্তু আশ্রয়

করছে। তা হলো রক্তচাপ বেড়ে যাওয়া, ঘুম না হওয়া। আর তা থেকেই দেখা দেবে নানাধরনের গোলমাল। পরে হার্টও বাদ যাবে না। এমন সাধ করে এ সব রোগ কেন তুমি ডেকে আনছ?

মেয়েটি বলে—ডাক্তারবাবু, আমি বাঁচতে চাই, মরতে আমি চাই না। আমার স্বামীকে, পরিবারকে আমি সুখী করতে চাই। কিন্তু পারি না, তার কারণ নানাধরনের বিষময় চিন্তা আমাকে পাগল করে দিচ্ছে।

আমি বলি—এর হাত থেকে যদি অব্যাহতি পেতে চাও, তা হলে তোমাকে অভ্যাস করতে হবে মনের কয়েকটা ব্যায়াম। যখনই ভুল বা দুঃখকর চিন্তা তোমার মনের মধ্যে আসবে, তখনই তাকে ঝেড়ে ফেলবে। তার স্থলে তুমি চিন্তা করতে চেষ্টা করবে—"আমার স্বামী আমাকে ভালবাসেন, তাঁকে এবং পরিবারকে সুখী করাই আমার লক্ষ্য। সুস্থ এবং সবল সন্তানের জন্ম আমায় দিতে হবে, এবং প্রকৃত মা হতে হবে।"

কোনও রকম দুঃখকর চিন্তা বা রাগের চিন্তা যখনই মনে উদয় হবে, তখনই চিন্তা করবে—"আমার সমস্ত অপরাধ এঁরা ক্ষমা করেছেন, বিনিময়ে এঁদের ভালবাসাই আমার কর্তব্য ও ধর্ম।"

এক মাস পরে মেয়েটি আমার চেম্বারে আবার আসে। মুখে হাসিখুশি ভাব, কালিমা একেবারে কেটে গেছে। তার জায়গায় ফুটেছে একটা সুন্দর স্বাস্থ্যের লক্ষণ। উদ্‌ভ্রান্ত চোখের দৃষ্টি হয়েছে উজ্জ্বল।

রক্তচাপ পরীক্ষা করে দেখলাম একেবারে সাধারণ। রাতে ঘুমও সাধারণ মানুষের মতই হচ্ছে।

আর একটি রোগীর কথা বলি। লোকটির ছিল একটি মুদীখানার দোকান। অপর দিকে ছিল মুখরা স্ত্রী এবং মা। ছেলেটি

কাউকেই ফেলতে পারে না। অথচ শান্তিও পায় না। বাড়ি ছেড়েও যেতে পারে না কারণ এদের প্রতি তার একটা কর্তব্য রয়েছে।

ওদিকে দোকানের অর্থনৈতিক অবস্থার জন্য আয়ও অনেক কমে গেছে। কিন্তু আয় কমার কথা মা বা স্ত্রী কেউই গ্রাহ্য করে না। বরং অর্থাগম কম হওয়াতে মা ও স্ত্রীর রেষারেষি যেন বেড়ে যায়। সব ঝক্কিটা এসে পড়তো লোকটির ঘাড়ে। ফলে তার অশান্তির আর শেষ ছিল না।

এই অশান্তি থেকে প্রথমে শুরু হলো অরুচি। পরে পেটে ব্যথা। অসহ্য যন্ত্রণা। এত অসহ্য যে লোকটি মাঝে মাঝে অজ্ঞান হয়ে পড়তো। বহু চিকিৎসক তাকে দেখলেন। ওষুধও সে খেল। কিন্তু ঐ—সাময়িক কমে, আবার হয়। রোগের কারণ কিছু পাওয়া যায় না।

এই সময়ে হঠাৎ ছেলেটি আমায় বললো—দেখুন ডাক্তারবাবু, যখনই আমি ফুটবল খেলা দেখতে যাই তখনই আমার কেন জানি না সব কষ্ট সেরে যায়। হজমও বেশ ভাল হতে থাকে।

খানিকটা সূত্র পেয়ে আমি তাকে আরও গোটাকতক প্রশ্ন করি। তারপর তাকে বলি—দিনরাত অশান্তি আর অর্থনৈতিক চাপেতে কোনও কাজেই বোধ হয় তোমার মনঃসংযোগ হচ্ছে না। আর সেই ফাঁকে কোন গোপন চিন্তা তোমার অবচেতন মনে থেকে তোমার রোগ কামনা করছে। যাতে শারীরিক অসুস্থতা দেখিয়ে তুমি তোমার মা আর স্ত্রীকে ঠাণ্ডা রাখতে পার।

রোগীটি শুনে তো চমকে ওঠে। আমাকে বলে—বলেন কি ডাক্তারবাবু! তাও আবার কি কখনও হয়?

আমি বলি—হয়। আর এই ভুল চিন্তার প্রভাবেই তোমার দেহে আশ্রয় নেবে কোনও একটা যন্ত্রণাদায়ক রোগ।

লোকটি বলে—এখন উপায় ?

আমি বলি—এখন থেকে চিন্তা কর—"বাইরের কোন ঘটনার জন্যেই আমি মন খারাপ করব না। মন দিয়ে আমি আমার কর্তব্যটুকু করে যাব, তারপর যা হবার হোক। আমাকে সুস্থ, সবল দেহে ও মনে বাঁচতে হবে। আমি না বাঁচলে এদের দেখবে কে ?"

ওষুধে যে ফল হয়নি, এই ধরনের মানসিক ব্যায়ামে সে ফল ফললো। লোকটি সুস্থ হয়ে গেল।

আবার দেখেছি, বাস্তবকে উপেক্ষা করে, কেবল নিজের কল্পনা অনুযায়ী একটি চিন্তা করে মানুষ কি কষ্টটাই না পেয়েছে !

একবার আমার কাছে এক রোগিণী এসেছিল। বছর দুয়েক হলো বিয়ে হয়েছে। বিয়ের বছর খানেক পর থেকে তার আর কিছুই ভাল লাগে না। দু'বার ইতিমধ্যে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল, কিন্তু পারেনি।

সমীক্ষা করে জানলাম, এক মধ্যবিত্ত গৃহস্থের কন্যা সে। তার দিদিকে সুন্দর দেখতে বলে, ছেলেবয়সেই বিরাট বড়লোকের ঘরে তার বিয়ে হয়। তাকে কিন্তু দেখতে ভাল ছিল না। কিন্তু তবুও সে মনে মনে কল্পনা করে নিল, দিদির বয়সে পৌঁছুতে পারলেই তারও অমনি বড়লোকের সঙ্গে বিয়ে হবে।

সে বয়স তার পার হয়ে গেল। তার বিয়ে কিন্তু হলো না।

আরও পাঁচ সাত বছর অপেক্ষা করবার পর এক সাধারণ কেরানীর সঙ্গে তার অনেক কষ্টে বিয়ে হলো। গয়না কাপড়

তো দূরে থাক, তার জামাইবাবুর মতন সুন্দর চেহারাও তার স্বামীর নয়।

বিবাহজ মোহ কেটে যাবার পরই তার জীবনে শুরু হলো হতাশা। এমন হতাশা, যার ফলে মেয়েটি কোনদিন সংসার করতে পারলো না।

মনের কোন ব্যায়াম সে অভ্যাস করতে চাইলো না। কেবলই বললো—আমার দিদির যখন এমন বিয়ে হলো, তখন আমার কেন হলো না! আমরা তো এক বাপ মায়েরই সন্তান।

ব্যবহারিক জীবনকে উপেক্ষা করে, কেবল কল্পনাকে আশ্রয় করে মেয়েটি ছুটে যেতে চাইলো একটি অনির্দিষ্ট জীবনের পথে। যার ফলে তার জীবন তো নষ্ট হলোই, আর একটি নির্দোষ ছেলের জীবন নষ্ট হয়ে গেল।

উপরোক্ত ঘটনা থেকে আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারছি, হতাশা, দুশ্চিন্তা, লজ্জা অবচেতন মনে থেকে মানুষকে কত সাংঘাতিক ক্ষতির পথে নিয়ে যায়।

শুধু তাই নয়, মানুষের মনের সুস্থতাও নষ্ট করে। আর এই সমস্ত চিন্তাকে যদি আমরা জোর করে মন থেকে তাড়িয়ে না দিতে পারি, তা হলে মানসিক রোগ ধীরে ধীরে আমাদের আক্রান্ত করতে পারে।

সমাজে অনেক সময় দেখেছি, নিজের অবস্থাকে চেপে রেখে বাইরের ঠাট বজায় রাখা একটা বড়লোকিপনা করার চেষ্টা।

যেমন ধরুন, মাসের শেষ হয়ে আসছে। আপনার কোন বড়লোক আত্মীয় আপনাকে বিয়ে বা অন্নপ্রাশনে নিমন্ত্রণ জানালেন। মাসের শেষে সংসারের টানাটানি উপেক্ষা করেও

আপনি তাঁকে দশটাকার একটা উপহার কিনে দিলেন। অথচ দু'টাকার বেশী খরচ করা আপনার পক্ষে তখন কষ্টসাধ্য।

কেউ যদি আপনাকে প্রশ্ন করে—এমনটি কেন করলেন?

আপনি বলবেন—লোকে কি বলবে!

আমার অভিজ্ঞতা দিয়ে আমি দেখেছি, মাসের শেষে কষ্ট করে দশটা টাকা যে আপনি খরচা করলেন তার দাম, যাদের জন্য তা করলেন তা তারা দেয় না।

এমনটি ঘটে আপনার অবচেতন মনে লজ্জার বোধ প্রখর হয়ে আছে বলে।

তাই বলছি জোর করে আমাদের চিন্তাগুলিকে ঠিক পথে নিয়ন্ত্রণ করা একান্তই আবশ্যক।

সমাজে চলতে গিয়ে আমরা বহুবার দেখেছি, এক একজনের অভ্যাস থাকে গভীরভাবে পরচর্চা করা। শুধু পরচর্চা নয়, কেমন করে তাকে ছোট প্রতিপন্ন করা যায় তারই চেষ্টা করা। এটা সাধারণতঃ সৃষ্ট হয় অতীত জীবনের কোনও একটা নির্দিষ্ট অপরাধ থেকে। কিংবা অপরকে ঈর্ষা করার ফলে।

এই ধরনের চিন্তা মানুষের জীবনে সুখশান্তি নষ্ট করে এবং অশান্তির সাগরে ডোবায়। যখনই মনে এই রকম চিন্তা উঠবে তখনই আমাদের মনে করতে হবে, আমাদের সুখে বাঁচতে হবে, এবং সমাজে থাকতে গেলে কখন যে আমার কাকে প্রয়োজন হবে তার কিছুই ঠিক নেই। তাই ভালবাসা দিয়ে সকলকেই আপনার করে নেওয়া প্রয়োজন আমার আছে।

আবার কোথাও কোথাও দেখেছি, মানুষ নিজেকেও ঘৃণা করছে অপরকেও তার সঙ্গে ঘৃণা করছে। ফলে বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন সকলেই তার কাছ থেকে দূরে সরে যেতে চাইছে।

এ ধরনের চিন্তা মনে উঠলেই তাকে দূর করা একান্ত প্রয়োজন।

এ ছাড়া পরাজয়ের মনোভাব, হতাশা, ক্লান্তি এসব তো আছেই।

আজকের শেষ কথাতে বলি, সব ধর্মেই বলে, আমরা যদি ভালভাবে বাঁচতে চাই তা হলে ভগবান্ আমাদের তার সুযোগও দেন। সুতরাং তাঁর ওপর বিশ্বাস রেখে ধীরে ধীরে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে সাফল্যের দিকে, নইলে আমার নিজের তৈরী চিন্তা আমাকে দলে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবে।

একজন ভদ্রলোক সব সময় ভাবতেন, তাঁর স্ত্রী বুঝি তাঁকে ভালবাসেন না। কারণ তাঁর চেহারাটা খুব ভাল ছিল না। ঐ ভদ্রলোক একদিন দেখেন, তাঁর চেয়েও দশ বারো বছরের বড় ভায়রাভাই তাঁর স্ত্রীর কাঁধের ওপর হাত রেখে হেসে হেসে কথা বলছেন।

চিন্তার মোড় ঘুরলো। সন্দেহের বিষ উঠলো। ভদ্রলোকও চিরদিনের মত হারিয়ে ফেললেন তাঁর সুস্থতা।

সমীক্ষা করে কতবার তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করেছি, ওটা কিছু নয়। উত্তরে ভদ্রলোক একই কথা বলেছেন—আমার স্ত্রী আমাকে পছন্দ করে না।

তাই বলছি সুখ, আনন্দ আর হাসির মধ্য দিয়ে নিজের জীবনটাকে চালিয়ে নিয়ে যাবেন। আর যতদূর সম্ভব দুঃখকর চিন্তার মধ্যে যাবেন না। জানবেন আপনি যদি জগৎকে এতটুকু ভালবাসেন, ভালবাসার কাজ দেখান তাহলে জগৎও আপনাকে ভালবাসার জন্য তৈরী হয়ে আছে।

শুভবিবাহ

সেদিন রাত্রে বাড়ি ফিরে খাওয়াদাওয়া সেরে নিয়ে শুয়ে পড়লাম।

ঘুম আসছিল। হঠাৎ কানে ভেসে এলো, বেহাগ-রাগিণীতে সানাইয়ের সুর।

তন্দ্রা ছুটে গেল। শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলাম, এত রাত্রে সানাই বাজে কোথায়?

পরমুহূর্তেই মনে হলো, আমার বাড়ির দুখানা বাড়ির পর প্রতিবেশী ঘোষবাবুর মেয়ের আজ বিয়ে।

মেয়েটিকে ছেলেবয়েস থেকেই আমি জানি। দিব্যি সুন্দর ফুটফুটে মেয়ে। ছেলেবয়েস থেকে আমায় 'কাকাবাবু' 'কাকাবাবু' বলে ডাকে।

ওর বাবা, ঘোষদা, আমাকে অনেক করে যেতে বলেছিলেন। কিন্তু কাজের চাপে ভুলেই গিয়েছিলাম সে কথাটা। ভাবলাম কাল সকালে উঠে একবার দেখা করে এলেই হবে।

ভগবানের চরণে প্রার্থনা করলাম মেয়েটি যেন সুখী হয়। প্রার্থনা করতে গিয়ে আমার একটা কথা মনে পড়লো।

ঘোষদার মেয়ে পুঁটুরানীর মতন আজ হয়তো বহু মেয়েরই বিয়ে হচ্ছে কিন্তু তারা সকলেই সুখী হচ্ছে কি?

মানসিক ডাক্তার হিসেবে আমি তো জানি, তা হচ্ছে না। এবং এই না-হওয়ার প্রতিক্রিয়া ঘটছে তাদের মনের ওপরে এবং দেখা দিচ্ছে তাদের মানসিক ব্যাধি।

কেন এমনটি ঘটে আজ সেই কথাই বলব।

বাপ মা পাত্র ঠিক করলেন। পাত্রপক্ষও পাত্রী দেখে পছন্দ করলেন। অথচ যারা বিবাহিত হবে তারা পরস্পরকে চিনলো না বুঝলো না।

একদিন এক শুভলগ্নে সেই পাত্র আর পাত্রীর চার হাত এক হয়ে গেল।

ফুলশয্যার রাত্রে দুজন দুজনকে কাছে পেল। চুম্বন আর আলিঙ্গনের মধ্যে তাদের দেহে লাগলো শিহরন। শুরু হলো দুজনকারই যৌন জীবন। সেই আনন্দে বিভোর হয়ে স্বামী স্ত্রী দুজন দুজনকে মনে করলো তারা পরস্পরকে ভালবেসেছে।

কিন্তু সেই ভালবাসা তাদের ছুটে গেল একটি শিশু জন্মাবার পর অথবা বছর দু'একের মধ্যেই।

তখন তাদের প্রেমালাপন এত উচ্চস্বরে হতে লাগলো যে বাড়ির লোকেও জানতে পারলো সে কথা।

কর্তারা বললেন—এমনটি হয়েই থাকে। আর ছেলের মা চোখের জল ফেলে বললেন—যত সব ছোটলোকের ঘরের মেয়ে কিনা! তাই আমার সংসার ভেঙে গেল।

অপর দিকে মেয়ের মা মন্তব্য করলেন—আমি জানতুম, ওরা ঐ রকম হাঘরে, আমার খুকুকে হাত পা বেঁধে জলে ফেলে দেওয়া হলো।

মেয়ের বাবা আর কি বলবেন! তিনি ভাবেন সব দোষটাই বুঝি তাঁর। কারণ তিনি বিয়ের সময় অনেক টাকা খরচা করে আরও ভাল পাত্র কিনতে পারেননি। যেটুকু পেরেছেন, তাতেই তাঁর বাড়ি বন্ধক পড়েছে।

তাই বড়লোক না হয়ে মেয়ের বাপ হওয়া যেন মহা অপরাধ। কিন্তু পাত্রপক্ষ এবং কন্যাপক্ষ পরস্পরকে দোষী করলেও,

আসলে গোলমালটা যে কোথায় তার খবর কেউ রাখে না রাখতে চায়ও না।

ফলে স্বামী বা স্ত্রী নিত্যনৈমিত্তিক পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া অশান্তি টেনে আনে। এই অশান্ত পরিবেশের মধ্যে থাকতে থাকতেই দেখা দেয় তাদের মনের বিকার।

যেমন ধরুন, একটি মেয়ে ছেলেবয়েস থেকে দেখেছে তার মাকে তার বাবাকে চালিয়ে নিয়ে যেতে।

ফলে সেও মনে মনে কল্পনা করে বসলো, বিয়ের পর সেও তার স্বামীকে চালিয়ে নিয়ে বেড়াবে।

অপরদিকে যে তার স্বামী হলো, সে আজীবন কল্পনা করেছে তার স্ত্রী হবে শান্ত, স্বল্পভাষিণী আর গৃহকাজে নিপুণা। সে যা বলবে কোন প্রশ্ন না তুলেই তার স্ত্রী তখনই সেই কাজই করবে।

এককথায় তার স্ত্রী হবে তার প্রতি নির্ভরশীলা।

বিয়ের কিছুদিনের মধ্যেই দুজন দুজনকে বুঝতে পারলো। তখন শুরু হলো খিটিমিটি।

শাশুড়ী বিরক্ত হয়ে বললেন—রূপের তলায় কি অহংকারই না লুকোনো ছিল!

বলতে ভুলে গিয়েছি মেয়েটি ছিল রূপসী।

ছেলেটিরও ধারণা হলো, সব সুন্দরী মেয়েই বুঝি এমনি অহংকারী।

কিন্তু এ ক্ষেত্রে রূপ কিছুই নয়। মনের আর আদর্শের মিল হলো না বলেই বিয়েও সুখের হলো না।

একবার আমার এক রোগিণী, সমীক্ষা করতে করতে বললো—আমি কি করে সুখী হব বলুন ডাক্তারবাবু! বিয়ের পরদিন থেকেই আমার স্বামী, শাশুড়ী সকলে মিলে বলতে শুরু করেছেন,

আমি কেন মা হচ্ছি না। আর এই বয়সে মা হলেই তো আমি বুড়ো হয়ে যাব। আমার সাধ-আহ্লাদ কিছু মিটবে না। ছেলে কোলে করে ঘুরতে হবে, তার কাঁথা কাচতে হবে—ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ, এ আমি পারব না! এও সহ্য করে ছিলাম। তার ওপর নিত্য দুবেলা রান্নাঘরে যাওয়া!

আমি বলি—অপরকে রান্না করে খেতে দিয়ে তুমি সুখ পাও না?

মেয়েটি জবাব দিল—এক আধ দিন ভাল লাগে। কিন্তু ঐ পঞ্চাশ জনের দু' বেলার পিণ্ডির যোগাড় যদি আমায় করতে হয়, তা হলে আমি অন্য কাজ করি কখন বলুন! এত করে বলি একটা ঠাকুর রাখতে, তাও রাখবে না।

আমি জিজ্ঞেস করি—কি কাজ তোমার?

মেয়েটি বলে—এই দেখুন, সপ্তাহে দু তিন দিন সিনেমা দেখতে যাওয়া। তারপরে ধরুন পার্কে বেড়ানো আছে, প্রতিবেশিনীদের সঙ্গে গল্প করা আছে। আমি গান গাইতে পারি—আমার গলাসাধা আছে। তা নয়, খালি রান্না আর রান্না!

আমি বলি—বেশ তো, এগুলো তো রান্না সেরেও করা যায়। জান তো, কথায় আছে, যে রাঁধে সে কি চুল বাঁধে না?

মেয়েটি এবার বিরক্ত হয়ে গিয়ে বলে—না বাঁধে না, বাঁধতে পারে না। কারণ আগুনের হল্কায় তার মুখের চামড়ার রং নষ্ট হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, আগুনের তাতে তার চুলও উঠে যায়।

মেয়েটির স্বামীকে বলি তার স্ত্রীর মনোভাবের কথা। বলি—একটু মানিয়ে চলুন না। দেখুন না উনি যা বলেন, তা করা সম্ভব কি না?

ভদ্রলোক তো আমাকে এই মারেন তো এই মারেন।

তিনি বলেন—মেয়েছেলে রান্না করবে না, খালি গান গাইবে, কেন সে কি ফিলিমে নামবে? তা হলে আমার সংসার করে কি লাভ?

লাভ? মনে হলো একবার বলি—লাভের কথা ভাবা উচিত ছিল আরও দু বছর আগে, বিয়ের সময়। কিন্তু তখন সে কথা বললে তিনি বুঝবেন না, তাই আমি চুপ করেই রইলাম।

এ থেকে আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারছি, বিয়ের সময় আমরা মন্ত্রে যতই বলি না কেন,—"যেমনটি আমার হৃদয়, তেমনটি তোমার হোক। আজ থেকে আমাদের দুয়ের ভিন্ন অস্তিত্ব নেই, আমরা দুয়ে এক, একে দুই।"—সব মন্ত্র সফল করাতে দরকার হয় সাধনা। এ ক্ষেত্রেই বা হবে না কেন?

আপনারা হয়তো আমায় প্রশ্ন করবেন—তার যে মশাই বিয়ের পর নতুন বউকে দেখবার জন্যে প্রাণ হাঁকপাঁক করে, একবার দর্শনে স্পর্শনে শরীরে পুলক লাগে, সেটা কি ভালবাসা নয়? তাছাড়া, এই যে সুন্দরী মেয়েদের কুৎসিত পুরুষের সঙ্গে বিয়ে হয়, সুন্দর পুরুষের সঙ্গে কালো মেয়ের বিয়ে হয়, তাদেরও তো ভালবাসা হয়।

উত্তরে আমি বলব—ভালবাসা হবে না কেন। যেখানে গুণ আছে এবং সহনশীলতা আছে, সেইখানেই ভালবাসা আছে। রূপ চোখকে টানে বটে, কিন্তু বেশীক্ষণ কাছে ধরে রাখতে পারে না। ধরে রাখতে গেলে চাই গুণ। আর চাই মনের মিল।

কথাটা একটা উদাহরণ দিয়ে বলি। একবার একটি রুগী আসে আমার কাছে চিকিৎসিত হতে। রুগীটি প্রতিবেশী একটি

মেয়েকে ভালবাসে। তাদের প্রেম সবে শুরু হচ্ছে। ঠিক এমনি সময় কথাটা কিভাবে যেন জানাজানি হয়ে গেল।

ছেলের বাপ তৎক্ষণাৎ ছেলের জন্য আর একটি পাত্রী নিয়ে এলেন।

ছেলে জানালো ঘোরতর আপত্তি। সে অন্য কোন মেয়েকে বিয়ে করতে পারবে না তার মনোনীত পাত্রী ছাড়া।

বাপও বেঁকে বসলেন। ছেলে যদি তাঁর ইচ্ছেমত বিয়ে না করে তবে তাকে পথ দেখতে হবে।

ফলে ভাবনায় চিন্তায় ছেলের হলো অবসাদ রোগ। আমার কাছে ছেলেটি আসতে সব শুনে আমি বলি—তোমাদের এ প্রেম যখন অনেকদিনের নয়, যখন সবে এই মাসখানেক তোমাদের আলাপ-পরিচয় হয়েছে, তখন মিথ্যে মিথ্যে কেন বাবার মনে দুঃখ দিচ্ছ! তাছাড়া এ বিয়ে করলে তুমি সুখী হতে পারবে না।

ছেলেটি বলে—কেন ডাক্তারবাবু? প্রেম করে বিয়ে করলে সুখী হতে পারব না কেন?

আমি বলি—মাত্র একমাস তোমাদের পরিচয়, এতে কি প্রেম হবে?

ছেলেটি বিরক্ত হয়ে বলে—প্রেম করতে কি সময় লাগে নাকি? জানেন না প্রেম অন্ধ! তার পাত্র-পাত্রী নেই, সময়-অসময় নেই, স্থান-কাল নেই।

আমি একটু গম্ভীর হয়ে আছি বলে ছেলেটি আমাকে বললো—কথা বলছেন না যে?

আমি বলি—কি বলব বল তো তোমায়? আর আমি যা বলব তা তোমার মনোমত হবেও না।

ছেলেটি ঘাবড়ে গিয়ে বলে—কেন ডাক্তারবাবু, প্রেম কি অন্ধ নয়?

আমি বলি—না। বরং ঠিক তার উল্টো। কাম অন্ধ, প্রেম সর্বদর্শী। মেয়েটির জন্যে তুমি যে আকর্ষণ বোধ করছ তার উৎপত্তি হয়েছে প্রেম থেকে নয়, কাম থেকে। তাই তোমার বাপের কথাও তুমি আজ মেনে নিতে পারছ না। একটা অনিশ্চিত জীবনযাত্রার দিকে ছুটে চলেছ, যাতে তুমি সুখী হবে কিনা সে বিষয়ে তোমার নিজের মনেই সন্দেহ রয়েছে। তার প্রমাণ তোমার এই অবসাদ রোগ। মনে রেখ কাম চায় নিজের স্বার্থপূরণ আর প্রেম চায় অপরের সুখ।

ছেলেটি খানিকক্ষণ কি যেন ভাবলো। তারপরে আমায় বললো—তবে ডাক্তারবাবু, কোন্‌টা কাম, কোন্‌টা প্রেম কি করে বুঝবো?

আমি বলি—সে জিনিস কি তুমি বুঝতে চাও?

ছেলেটি বলে—হ্যাঁ।

আমি বলি—প্রত্যেক পুরুষ স্ত্রীর প্রতি আর প্রত্যেক স্ত্রী পুরুষের প্রতি একটা সহজাত আকর্ষণ অনুভব করে। এই আকর্ষণ ওঠে যৌন প্রবৃত্তি থেকে। অথচ প্রেম মানুষের মধ্যে তখনই আসে যখন পরস্পরের মধ্যে মনের আদান-প্রদান বা মিল হয়। এতে দুজন দুজনকে সুখী করতে চায়। তার জন্যে সমস্ত কষ্ট তারা হাসিমুখে সহ্য করতে প্রস্তুত। প্রেম করতে গেলে চাই সময়, এবং পরস্পরের মধ্যে মনের মিল। এত সহজে তা হয় না, হতে পারেও না।

ছেলেটি আমার কথা ভাবতে ভাবতে সেদিনকার মত চলে গেল।

এখন দেখা যাক, আমাদের বিবাহিত জীবনে আর কোন্ কোন্ সমস্যার জন্য তা অ-সুখের হয়ে ওঠে।

প্রথমতঃ—আমাদের বুঝতে হবে মানুষ বিবাহ করে কেন! সাধারণতঃ দেখা যায় যৌন জীবনযাপন করবার জন্যে মানুষের বিবাহের প্রয়োজন।

এ ক্ষেত্রে উভয় পক্ষই যদি যৌন জীবনে আনন্দ না পায় তা হলে বিবাহ সুখের হয় না। তাই বলে আমি এই মানে করছি না, একপক্ষের যৌনাবেগ প্রবল হলেই তা অপর পক্ষকে মেটাতে হবে।

ইচ্ছার বিরুদ্ধে যদি মানুষ যৌন জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়, তা হলে তাতে ফল ভাল হয় না। মানসিক ক্ষতি তো হয়ই, তা ছাড়া সুস্থ সন্তানের জন্ম এসব ক্ষেত্রে কমই হয়।

একবার আমার একটি রোগিণী আমাকে বলেছিল—ডাক্তারবাবু, পারেন আমার স্বামীর হাত থেকে আমায় রক্ষা করতে?

আমি প্রশ্ন করি—কেন মা?

মেয়েটি বলে—ইচ্ছার বিরুদ্ধেও ওর সঙ্গে আমাকে সহবাস করতে হয়। তার ফলে আমার স্বাস্থ্যও খারাপ হয়ে যাচ্ছে। এই দেখুন, আমার ছটি ছেলেমেয়ে। বাছাদের প্রত্যেককে ভাল খাওয়াতে পরাতেও পারি না। দিনরাত দুশ্চিন্তায় আমার স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ছে। তার ওপর ড্রাই প্লুরিসিও দেখা দিয়েছে। —এই পর্যন্ত বলে মেয়েটি চুপ করে গিয়ে কাঁদতে থাকে।

আমি তার স্বামীকে ডেকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম সব কথা।

ভদ্রলোক একটু গম্ভীর হয়ে গিয়ে কেবল জবাবে বললেন—তা হলে কি ডাক্তারবাবু আপনি আমাকে গণিকালয়ে যাতায়াত করতে বলেন?

আমি বলি—তা আপনাকে বলি না। তবে তাঁর দিকটাও তো চিন্তা করতে হবে।

ভদ্রলোক উত্তরে বলেন—তারও কি কর্তব্য নয় আমায় সুখী করা !

আমি বলি—সত্যি কথা। কিন্তু তাঁর স্বাস্থ্যের কথাও আপনি ভাবুন। আপনাদের উভয় পক্ষে, স্বাভাবিক আকর্ষণে আপনারা না যদি যৌন জীবনযাপন করেন, তা হলে আপনি তো এ ব্যাপারে বিশেষ আনন্দ পাবেন না।

ভদ্রলোক এ ব্যাপারটা কতদূর বুঝেছিলেন জানি না, তবে শুনেছিলাম মাসদুয়েক পরে তাঁর আর কিছুই ভাল লাগতো না। কেমন যেন ভয় ভয় করতো। এর প্রধান কারণ যৌন জীবন-যাপনকেই স্বামী স্ত্রীর প্রধান সম্বন্ধ বলে ভাবতেন।

সাধারণতঃ দেখা যায়, এসব ক্ষেত্রে এক পক্ষ হন দুর্বল, অপর পক্ষ হন সবল। তখন, দুর্বলের জন্য ভালবাসা দিয়ে সবলকে মানিয়ে নিতে হবে। তবেই জীবন সুখ আর শান্তিতে ভরে যাবে। আর মানিয়ে না নিতে পারলেই অশান্তির আর অবধি থাকবে না।

দ্বিতীয়তঃ—আর একটি ক্ষেত্রে বিয়ে অসুখের হয়ে ওঠে। বিবাহের পরও বাপ মা তাঁদের অভ্যাসের দোষেই ছেলেমেয়ের ওপর হুকুম চালাতে আরম্ভ করেন।

অথচ তারা বড় হয়েছে। স্বাধীন জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে তারা চায়, তাতে অনবরত বাধাপ্রাপ্ত হলে স্বামী স্ত্রীর বিবাহিত জীবনও সুখের হয় না। প্রথম বাইরে থেকে আসে অশান্তি, পরে তা সংক্রামিত হয় স্বামী স্ত্রীর জীবনের মধ্যে। তাতে আসে হতাশা।

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এসব জায়গায় মেয়েরা হয় অসুস্থ। কারণ বিবাহের সঙ্গে মেয়েদের পারিপার্শ্বিক পরিবর্তন হয় বেশী। যৌবনের রঙীন স্বপ্ন তাদের যায় ভেঙে। আমাদের দেশীয় আচার ও শিক্ষার অনুপাতে স্বামী আর স্বামীর ঘর ছাড়া তারা আর কিছু কল্পনা করতে পারে না। তাই তারা দুশ্চিন্তা আর হতাশার হাত থেকে অব্যাহতিও পায় না। এসব ক্ষেত্রে আমি

বলব সকলকারই মনে রাখা উচিত কারুর জীবন একভাবে যায় না বা যেতে পারে না। অন্ধকার রাত্রির শেষে আলো প্রত্যেকের জীবনেই আসবে। সেই আশাতেই বেঁচে থাকতে হবে এবং প্রতীক্ষা করতে হবে সুখের দিনের।

এত কথা বলছি কেন তার কারণ আমার মনকে দোল দিয়ে যায়, যখন আমি দেখি বিবাহের সাত দিন পনেরো দিন বা এক মাস পরেই মানসিক পীড়ায় অসুস্থ হয়ে রোগিণীরা আমার কাছে আসে চিকিৎসিত হতে। তখন আমার মনে হয়, ওদের দুজন-কার ভেতর যিনি সুস্থ আছেন তাঁর কি দুঃসহ মনের যন্ত্রণা! তাই এই সাবধানবাণী।

আর একটা ব্যাপারেও স্বামী স্ত্রীর মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। সেটা হলো সন্তানের শিক্ষাদীক্ষা নিয়ে।

ব্যাপারটা পরিষ্কার করেই বলি।

ধরুন মা ম্যাট্রিক পাস। বাবা কোনও রকমভাবে আই. এ. অবধি পড়েছেন।

এ ক্ষেত্রে ছেলের লেখাপড়ার ভার বাপই নিয়েছেন, কারণ স্ত্রী থাকেন রান্নাঘরে। তাঁর সে সময় কোথায়।

একদিন হঠাৎ স্ত্রী এসে দেখলেন বাপ ছেলেকে পড়াচ্ছেন।

তিনি বললেন—বলি, ওটা কি হচ্ছে? ছেলেকে নিয়ে বসে থাকলেই চলবে? একবার দোকানে যাও না।

স্বামী একটু তর্জন-গর্জন করে জবাব দিলেন—পড়ার সময় গোলমাল না করলেই নয়! আমি এখন যেতে পারব না।

স্ত্রীর মনটা ভাল ছিল না। ফট্ করে তিনি বলে ফেললেন—তবুও যদি এম. এ. পাস করতে! আই. এ.-ও তো পাস করতে পারনি। আবার কথা বলছ যে! তোমার লেখাপড়ার দৌড় তো আমার জানা আছে!

নিদারুণ সত্যি কথা, প্রতিবাদ করা যায় না। কথাটা গিয়ে লাগলো একেবারে মর্মস্থলে।

স্বামী হয়তো পরের দিন থেকে ছেলেকে পড়ানোই ছেড়ে

দিলেন। দিনরাত ভাবতে লাগলেন, তিনি তো আই. এ.-ও পাস করতে পারেননি। তাঁর আর দাম কি আছে!

আবার অপর দিকে দেখা যায়, স্ত্রী হয়তো ম্যাট্রিক পাস, কি সামান্য লেখাপড়া করেছেন। স্বামী হয়তো এম. এ. পাস।

স্ত্রীকে ছেলে পড়াতে দেখে স্বামী হয়তো বললেন—তুমি খোকনকে আবার কি পড়াচ্ছ? ভুলভাল শিখিয়ে দেবে। ওসব করো না।

স্ত্রী বললেন—নাঃ না, সব মা-ই তো ছেলেকে অক্ষর চেনায়। আমি চেনালেই যত দোষ?

স্বামী বললেন—নাঃ দোষ আর কিছু নয়, তুমি লেখাপড়া কিছু জান না, একেবারে মুখ্যু তো!

মুখ্যু! কথাটা গিয়ে লাগলো স্ত্রীর মনে। সত্যিই তো আমি মুখ্যু, আমি তো আর লেখাপড়া জানি না বেশী। ইস্, মনে মনে উনি আমায় কি ঘেন্নাই করেন! আমার খোকনকে আমি এতটুকু লেখাপড়াও শেখাতে পারব না!

এই ধরনের এলোমেলো চিন্তা করতে করতে তিনি হলেন মানসিক রোগাক্রান্ত।

এখন এই ধরনের ব্যাপার ঘটতে আমরা নিত্যনৈমিত্তিকই দেখি। বিশেষ গুরুত্ব দিই না বলে, আমরা ঠিক উপলব্ধি করতে পারি না ব্যাপারটা। এসব ক্ষেত্রে, আমি বলি কি, এক পক্ষকে স্বার্থত্যাগ করতেই হবে। কারণ একসঙ্গে তুজনে সন্তানের শিক্ষার দায়িত্ব নেওয়া যায় না। নিজেদের ভেতর গোপনে আপোসে একটা পরামর্শ করে নেবেন। ছেলেমেয়েদের সামনে এই নিয়ে তর্ক করাও ভাল নয়। যাঁকে স্বার্থত্যাগ করতে হবে, তিনি যেন মনে রাখেন সন্তান তাঁদের তুজনেরই. তাই তার মঙ্গলটাই তাঁদের বেশী কাম্য হওয়া উচিত।

আজকাল আর একটা বিষয় স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মতবিরোধ ঘটাচ্ছে। সেটা হলো,—অর্থ।

অর্থনৈতিক চাপে আজ মধ্যবিত্ত সমাজ বা দেশের প্রায় প্রতিটি লোকই জর্জরিত।

পরিবারকে সুখে রাখবার জন্য স্বামী স্ত্রী উভয়কে করতে হচ্ছে রোজগার।

অনেক ক্ষেত্রে দেখেছি, স্ত্রী যা রোজগার করেন তার বেশীর ভাগটাই তুলে দিতে হয় স্বামীর হাতে। অথচ স্বামী, সেই টাকা নিয়ে, স্ত্রীকে হিসেব দিতে চান না।

নিজের শাড়ি বা ঐ ধরনের কোন একটা বিলাসের জিনিস কিনতে গেলেই স্বামীর কাছে খেতে হয় ধমক। ফলে মানসিক ব্যাধিও সৃষ্টি হয় তাঁর মনের মধ্যে। তখন তাঁর মনে ওঠে একটি-মাত্র প্রশ্ন—আমার এই হাড়ভাঙা খাটুনির পয়সার ওপর আমার কি নিজের কোনও অধিকার নেই? শুধু বেগার খেটে যাব আমি?

অপর দিকে দেখেছি, স্বামী রোজগার করেন, স্ত্রী হয়তো সংসার নিয়ে থাকেন। অথবা স্ত্রীও রোজগার করেন। স্ত্রী চান তাঁদের যৌথ টাকা থেকে যে টাকা উদ্বৃত্ত হলো, তা জমিয়ে একখানা বাড়ি কিনতে। কিংবা অন্য কিছু করতে।

অপর দিকে স্বামী হয়তো চান উদ্বৃত্ত টাকা নিয়ে সংসারের মান বাড়াতে। ফলে স্বামী স্ত্রীতে শুরু হয় দ্বন্দ্ব।

কিংবা বড়লোক স্বামী স্ত্রীকে নিজের আর্থিক অবস্থার কথা জানাতে চান না।

অপর দিকে স্ত্রীও সর্বদা উৎসুক স্বামীর আর্থিক অবস্থার কথা জানবার জন্য। কারণ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় মেয়েরা হয় নির্ভরশীলা।

এসব ক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রীর মিল হওয়ার চেয়েও অমিলটাই হয় বেশী। আর সেই অমিলে ঘটে যায় বিষম বিপদ।

আগেকার দিনে দম্পতীর জীবনে এই ধরনের গোলমাল মেটাতে প্রায় প্রতি সংসারেই পাওয়া যেত একজন বিধবা মাসী, পিসী অথবা দিদি, যে বৃদ্ধা আপ্রাণ চেষ্টা করতেন সংসারকে ধরে রাখবার জন্য। যিনি ভালবাসতেন পরিবারের প্রত্যেককে।

স্নেহে বেঁধে স্বামী স্ত্রীকে কাছে ডেকে, তিনি দুজনকার কথা শুনে এ ধরনের সমস্যার হাত থেকে তাদের রক্ষা করতেন, তাঁর উপদেশ দিয়ে।

আজকাল সমাজ পরিবর্তিত হয়েছে, বাড়তি লোকের স্থান কোথায়? তার ফলে এ সমস্ত সমস্যার সমাধানও হয় না। তাই লোকে মানসিক রোগগ্রস্ত হচ্ছে প্রচুর সংখ্যায়।

আমার তাই মনে হয়, যাঁকে উভয়েই শ্রদ্ধা করেন এমন একজন ব্যক্তি যদি স্নেহের সঙ্গে দুজনকার কথা শুনে উপদেশ দেন, তা হলে বোধ হয় ভাল হয়।

শেষ কথা বলি। আজকাল অধিকাংশ সমস্যা দেখা দিচ্ছে আমাদের দেরিতে বিয়ের দরুন।

বিয়ের আগে থেকেই কি ছেলে কি মেয়ে নিজেদের কল্পনানুযায়ী একটা জগৎ তৈরি করে রাখছেন। এই জগৎ অনুযায়ী তাঁদের জীবন যখন গড়ে ওঠে না তখন শুরু হয় মানসিক সংঘাত। তাই আমার অনুরোধ বিয়ের আগে কোন কল্পনার রাজ্যে ভ্রমণ করবেন না। আর যদি সম্ভব হয় নিজেদের আদর্শ সম্বন্ধে মিল আছে কিনা একবার দেখে নেবেন। নইলে শ্রদ্ধেয় পরশুরামের লেখা চরিত্র অনুযায়ী, চা-এ কে ক'চামচে চিনি খাবে তাই নিয়েই হয়তো সংঘাত লেগে যেতে পারে। তাই বিয়ের আগেই নকুড় মামাকে ডেকে এ ধরনের সমস্যাগুলোর সমাধান করে নেওয়াই ভাল।

সমাপ্ত